বিজ্ঞান

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বিজ্ঞান

ইবতেদায়ি

পঞ্চম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. আলী আসগর
ড. মোঃ আনোয়ারুল হক
কাজী আফরোজ জাহানআরা
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৫
পুনর্মুদ্রন: জুলাই ২০২৩
পরিমার্জিত সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

ইবতেদায়ি স্তর মাদ্রাসা শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসু করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে ইবতেদায়ি স্তরে **বিজ্ঞান** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলো সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, ছবি ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়াও পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞান শিক্ষার মূল দুটি ধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যার একটি হলো তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন, অন্যটি হলো প্রশ্ন উত্থাপন, পরীক্ষণ, তথ্য ও তত্ত্বের শুদ্ধতা যাচাইয়ের ভিতর দিয়ে অংশগ্রহণ।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্য চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

পরিমার্জিত ইবতেদায়ি বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. শিক্ষার্থী শিক্ষক বান্ধব

- শিক্ষার্থীর বুদ্ধির স্তর বিবেচনায় রেখে শিখনের বিষয়বস্তুর সচিত্র বর্ণনা ও উপস্থাপন করা হয়েছে এবং মুখস্থ করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর ধারণার বিকাশে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনপূর্বক নতুন পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে।
- শ্রেণি উপযোগী, সহজ ও সাবলীল ভাষায় পাঠের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে।
- স্পষ্ট শিরোনাম, উপশিরোনাম ও পাঠ সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত ছবি/চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
- বিজ্ঞানের বিমূর্ত বিষয়সমূহকে চিত্র/ছবি এবং যথাযথ বর্ণনার মাধ্যমে সহজ সরল এবং বোধগম্য উপায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- পাঠ উপস্থাপনে কিছু প্রতীক/সংকেত ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে।
- শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি ও চিন্তামূলক কাজে উৎসাহিত করার জন্য দুইটি চরিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
- প্রতিটি অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট নতুন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রঙিন ও মোটা অক্ষরে লেখা হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকের শেষে শব্দকোষ সংযুক্ত করা হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞানের নতুন শব্দগুলোর সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

২. সমস্যা সমাধানভিত্তিক শিখনে গুরুত্ব প্রদান

- প্রতিটি পাঠ একটি মূল প্রশ্ন বা key question এর মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ/ পরীক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আলোচনামূলক কাজের সুযোগ রাখা হয়েছে। পাঠের শেষে তথ্যসমৃদ্ধ সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিকল্প উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বিন্যাসে সমস্যা সমাধানভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে।
- বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে শিখন কার্যক্রমে সমস্যা সমাধানভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার অনুশীলনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

৩. পরিকল্পিত কাজ ও পরীক্ষণ

- শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং অনুসন্ধানমূলক কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা, প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য দলীয় আলোচনামূলক কাজের প্রবর্তন করা হয়েছে।
- স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সূচিপত্র

চরিত্র ও প্রতীক

১) চরিত্র

জুঁই

দিপু

জুঁই এবং দিপু তোমার বিজ্ঞান শিখনে কিছু ইঙ্গিত অথবা ধারণা দেবে। এসো আমরা এক সঙ্গে বিজ্ঞান শিখি।

২) প্রতীক

 কাজ : এসো আমরা পর্যবেক্ষণ করি, অনুসন্ধান করি এবং পরীক্ষা করে দেখি!

 আলোচনা : চলো আমরা সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি!

 সাবধান হও : নিরাপদ থাকার জন্য চলো আমরা সতর্কতার সাথে কাজ করি!

অধ্যায় ১

আমাদের পরিবেশ

১. জীব ও জড় বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক

পরিবেশের উপাদানগুলোকে আমরা জীব ও জড় এই দুই ভাগে ভাগ করি। মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা এরা হলো জীব। মাটি, পানি, বায়ু, গাড়ি, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি হলো জড়।

জীব ও জড় বস্তুর সম্পর্ক

প্রশ্ন : জীব কীভাবে জড়ের উপর নির্ভরশীল?

কাজ : বেঁচে থাকার জন্য জীবের যা প্রয়োজন

কী করতে হবে :

১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

জীব	বেঁচে থাকার জন্য যে জড় বস্তু প্রয়োজন
মানুষ	
অন্যান্য প্রাণী	
উদ্ভিদ	

২. জীবের বেঁচে থাকার জন্য যে সকল জড় বস্তুর প্রয়োজন তার একটি তালিকা তৈরি করি।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সূর্যের আলো ও বায়ু জীব না জড় ?

খাদ্য তৈরির জন্য উদ্ভিদের সূর্যের আলো, বাতাস ও অন্যান্য জিনিস প্রয়োজন।

২০২৫

সারসংক্ষেপ
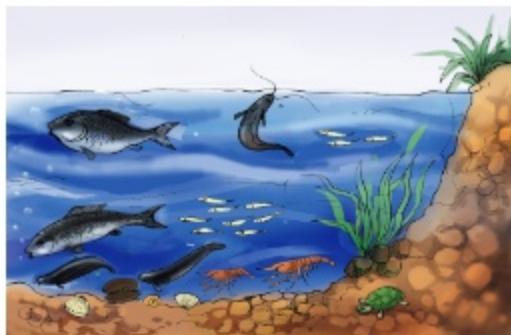
মানুষ

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ বিভিন্ন জড় বস্তুর উপর নির্ভর করে। মানুষের শ্বাস গ্রহণের জন্য বায়ু এবং পান করার জন্য পানি প্রয়োজন। পুষ্টির জন্য খাবার প্রয়োজন। ফসল ফলানো ও বাসস্থান তৈরির জন্য মানুষের মাটি প্রয়োজন। এছাড়াও জীবন যাপনের জন্য বাসস্থান, আসবাবপত্র, পোশাক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রয়োজন।

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ জড়ের উপর নির্ভরশীল

অন্যান্য প্রাণী

অন্যান্য প্রাণীও বেঁচে থাকার জন্য জড় বস্তুর উপর নির্ভরশীল। সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য বায়ু, পানি ও খাদ্য প্রয়োজন। মাটি এবং পানি অনেক জীবের বাসস্থান। অনেক পোকামাকড়, কেঁচো ইত্যাদি মাটিতে বাস করে। আবার মাছ, চিংড়ি পানিতে বাস করে।
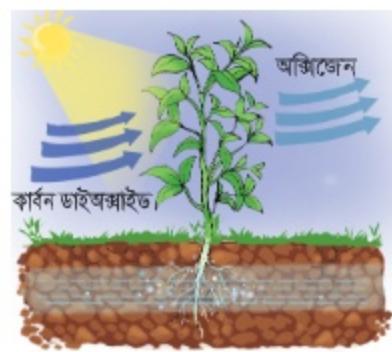
পানির জীব

মাটির জীব

উদ্ভিদ

বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদ পরিবেশের বিভিন্ন জড় বস্তুর উপর নির্ভর করে। যেমন– মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি। তাছাড়া সূর্যের আলোর উপরেও উদ্ভিদ নির্ভরশীল। উদ্ভিদ সূর্যের আলো, পানি ও বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। পানি আবার বিভিন্ন উদ্ভিদের **আবাসস্থল**। যেমন– শাপলা, কচুরিপানা ইত্যাদি।

উদ্ভিদ জড় বস্তুর উপর নির্ভরশীল

জীব বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের বিভিন্ন জড় বস্তুর উপর নির্ভরশীল। কোনো স্থানের সকল জীব ও জড় এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়াই হলো ওই স্থানের **বাস্তুসংস্থান**।

২. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

প্রশ্ন : উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল?

কাজ : পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

কী করতে হবে :

১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

জীব	কীভাবে পরস্পর নির্ভরশীল
উদ্ভিদ	
প্রাণী	

২. কীভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নিচের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে তার একটি তালিকা তৈরি করি।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

প্রাণী

প্রাণী বিভিন্নভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য তৈরির সময় উদ্ভিদের ত্যাগ করা অক্সিজেন প্রাণী শ্বাস গ্রহণের সময় ব্যবহার করে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ যেমন– কাণ্ড, শাখা ও ফলমূল প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ আবার অনেক প্রাণীর আবাসস্থল। বানর, কাঠবিড়ালি, পোকা-মাকড় ইত্যাদি গাছে বাস করে। পাখি গাছের ডালে বাসা বাঁধে। মানুষও তার বাসস্থান তৈরিতে উদ্ভিদ ব্যবহার করে।

উদ্ভিদ

উদ্ভিদ তার খাদ্য তৈরি, বৃদ্ধি, **পরাগায়ন** ও **বীজের বিস্তরণের** জন্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির জন্য প্রাণীর ত্যাগ করা কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে। পুষ্টি উপাদানের জন্যও উদ্ভিদ প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। প্রাণীর মৃতদেহ পচে প্রাকৃতিক সারে পরিণত হয়। এই সার পুষ্টি হিসেবে ব্যবহার করে উদ্ভিদ বেড়ে ওঠে।

পরাগায়ন

পরাগায়নের ফলে উদ্ভিদের বীজ সৃষ্টি হয়। এই বীজ থেকে আবার নতুন উদ্ভিদ জন্মায়। বিভিন্ন প্রাণী যেমন– পাখি, মৌমাছি ইত্যাদি এই পরাগায়নে সাহায্য করে। **মাতৃউদ্ভিদ** থেকে বিভিন্ন স্থানে বীজের ছড়িয়ে পড়াই হলো **বীজের বিস্তরণ**। বীজের বিস্তরণ নতুন নতুন উদ্ভিদ আবাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

এভাবেই পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

৩. শক্তি প্রবাহ

বেঁচে থাকার জন্য জীবের শক্তি প্রয়োজন। উদ্ভিদ সূর্য থেকে শক্তি পায়। আর প্রাণী শক্তি পায় খাদ্য থেকে।

প্রশ্ন : প্রাণী কীভাবে শক্তির জন্য অন্য জীবের উপর নির্ভরশীল ?

কাজ :

খাদ্য এবং খাদক

কী করতে হবে :
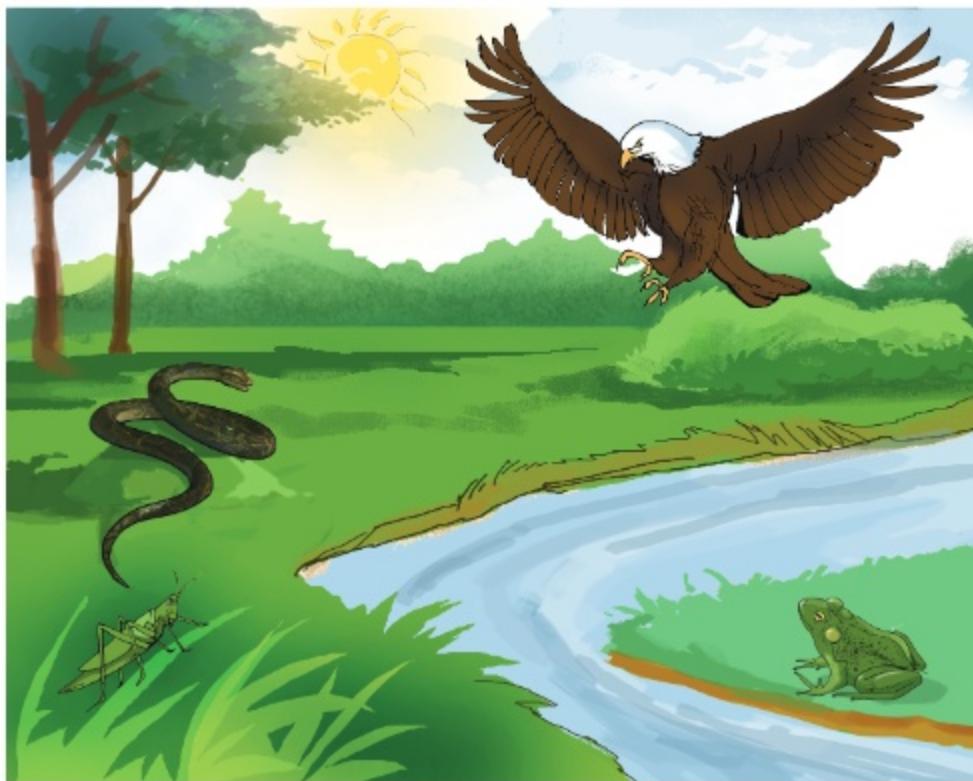
১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

খাদ্য এবং খাদকের মধ্যে সম্পর্ক								
	কে খায়		কে খায়		কে খায়		কে খায়	
	→		→		→		→	

২. নিচের ছবিটি দেখি। ছবি দেখে কে কাকে খায় তা ক্রমানুসারে ছকে লিখি।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

২০২৫

সারসংক্ষেপ

খাদ্য শৃঙ্খল

সকল প্রাণীই শক্তির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ সূর্যের আলো ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। পোকামাকড় উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে। আবার ব্যাঙ পোকামাকড়কে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। একইভাবে সাপ ব্যাঙ খায় এবং ঈগল সাপ খায়। এভাবেই শক্তি উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে প্রবাহিত হয়। বাস্তুসংস্থানে উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে শক্তি প্রবাহের এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হলো **খাদ্য শৃঙ্খল**। সবুজ উদ্ভিদ থেকেই প্রতিটি খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু।

খাদ্য শৃঙ্খল

খাদ্য জাল

যেকোনো বাস্তুসংস্থানে অনেকগুলো খাদ্য শৃঙ্খল থাকে। বাস্তুসংস্থানের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী কোনো না কোনো খাদ্য শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– ঈগল সাপ, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, ব্যাঙ ও অন্যান্য প্রাণী খেয়ে থাকে। আবার সাপ খরগোশ, ইঁদুর, ব্যাঙ ও অন্যান্য প্রাণী খায়। একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল একত্রিত হয়ে **খাদ্য জাল** তৈরি করে।

খাদ্য জাল

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) শক্তির মূল উৎস কোনটি?

ক. উদ্ভিদ　　খ. সূর্য

গ. চাঁদ　　ঘ. প্রাণী

২) কোনটির জন্য প্রাণী উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল ?

ক. আলো　　খ. পানি

গ. খাদ্য　　ঘ. বাতাস

৩) নিচের কোনটি সঠিক খাদ্য শৃঙ্খল ?

ক. ঘাস ফড়িং⟶ঘাস⟶সাপ⟶ব্যাঙ

খ. ব্যাঙ⟶ঘাস ফড়িং⟶ঘাস⟶সাপ

গ. সাপ⟶ঘাস ফড়িং⟶ঘাস⟶ব্যাঙ

ঘ. ঘাস⟶ঘাস ফড়িং⟶ব্যাঙ⟶সাপ

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) খাদ্য জাল ও খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে পার্থক্য কী ?

২) উদ্ভিদ কীভাবে প্রাণীর উপর নির্ভরশীল ?

৩) মানুষ নির্ভর করে এমন তিনটি জড় বস্তুর উদাহরণ দিই।

৪) পরাগায়ন কী ?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) খাদ্য শৃঙ্খলে কীভাবে সাপ এবং ঈগল একই রকম তা ব্যাখ্যা করি।

২) নিচের শব্দগুলো নিয়ে গঠিত খাদ্য শৃঙ্খলের সঠিক ক্রম ব্যাখ্যা করি।
ঈগল, সূর্য, ঘাস, পোকামাকড়, সাপ, ব্যাঙ

৩) জীব কীভাবে বায়ুর উপর নির্ভরশীল তা ব্যাখ্যা করি।

৪) উদ্ভিদের জন্য বীজের বিস্তরণ কেন গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করি।

৫) তোমার ঘরের ভেতরে রাখা গাছটি মারা যাচ্ছে। তোমার বন্ধুরা গাছটিকে জানালার পাশে নিয়ে রাখার পরামর্শ দিল। কেন ?

পরিবেশ দূষণ

বেঁচে থাকার জন্য আমরা পরিবেশকে নানাভাবে ব্যবহার করি। ফলে পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন যখন জীবের জন্য ক্ষতিকর হয়, তখন তাকে আমরা পরিবেশ দূষণ বলি। বিভিন্ন ক্ষতিকর ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশে মিশলে পরিবেশ দূষিত হয়।

১. আমাদের পরিবেশে দূষণ

প্রশ্ন : কী কী কারণে পরিবেশ দূষিত হয়?

কাজ : আমাদের চারপাশের পরিবেশ দূষণ

কী করতে হবে :

১. খাতায় একটি পর্যবেক্ষণ ফরম তৈরি করি।

পর্যবেক্ষণ ফরম

পর্যবেক্ষণের স্থান : পর্যবেক্ষণের তারিখ :

চলো প্রাপ্ত দূষণগুলোর ছবি আঁকি

২. শ্রেণিকক্ষের বাইরে আশপাশে বিভিন্ন ধরনের দূষণ খুঁজে বের করি।
৩. পর্যবেক্ষণ ফরমে দূষণগুলোর ছবি আঁকি।
৪. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

আলোচনা

◆ **নিচের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করি।**

১. আমাদের চারপাশে কী ধরনের দূষণ রয়েছে?

২. দূষণের কারণ কী?

৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে পৃথিবীর অনেক সমস্যার মধ্যে একটি বড় সমস্যা হলো পরিবেশ দূষণ।

পরিবেশ দূষণের উৎস ও কারণ

পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো **শিল্পায়ন**। শিল্পকারখানা সচল রাখতে বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন– তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারই দূষণের প্রধান উৎস। জনসংখ্যা বৃদ্ধি দূষণের আরও একটি বড় কারণ। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য মানুষ পরিবেশ ধ্বংস করছে। পরিবেশের বেশির ভাগ দূষণ মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের ফলেই হয়ে থাকে।

পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণের প্রভাব

দূষণের ফলে মানুষ, জীবজন্তু ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। দূষণের কারণে মানুষ বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যেমন– ক্যান্সার, শ্বাসজনিত রোগ, পানিবাহিত রোগ, ত্বকের রোগ ইত্যাদি। দূষণের ফলে জীবজন্তুর আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে। খাদ্য শৃঙ্খল ধ্বংস হচ্ছে। ফলে অনেক জীব পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হিমবাহ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে।

তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে হিমবাহ গলছে

২. বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ

বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দ দূষণের মাধ্যমেই সাধারণত পরিবেশ দূষিত হয়।

(১) বায়ু দূষণ

বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস, ধূলিকণা, ধোঁয়া অথবা দুর্গন্ধ বায়ুতে মিশে বায়ু দূষিত করে। যানবাহন ও কলকারখানার ধোঁয়া বায়ু দূষণের প্রধান কারণ। গাছপালা ও ময়লা আবর্জনা পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়ার মাধ্যমেও বায়ু দূষিত হয়। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা এবং মলমূত্র ত্যাগের ফলে বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়। বায়ু দূষণের ফলে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও এসিড বৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও মানুষ ফুসফুসের ক্যান্সার, শ্বাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

বায়ু দূষণের কারণ

এসিড বৃষ্টির ফলাফল

(২) পানি দূষণ

পানিতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ মিশ্রিত হয়ে পানি দূষিত হয়। পয়ঃনিষ্কাশন, গৃহস্থালি ও হাসপাতালের বর্জ্য দ্বারা পানি দূষিত হয়। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে। কারখানার ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে পানি দূষিত হয়। এছাড়া ময়লা আবর্জনা পানিতে ফেলা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদির মাধ্যমেও পানি দূষিত হয়। পানি দূষণের ফলে জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে এবং জলজ খাদ্য শৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটছে। পানি দূষণের কারণে মানুষ কলেরা বা ডায়রিয়ার মতো পানিবাহিত রোগে এবং বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

পানি দূষণের কারণ

পানি দূষণের ফলাফল

(৩) মাটি দূষণ

মাটি দূষণের কারণ

বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর বস্তু মাটিতে মেশার ফলে মাটি দূষিত হয়। কৃষিকাজে ব্যবহৃত সার ও **কীটনাশক**, গৃহস্থালি ও হাসপাতালের বর্জ্য, কলকারখানার বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও তেল ইত্যাদির মাধ্যমে মাটি দূষিত হয়। মাটি দূষণের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। গাছপালা ও পশুপাখি মারা যায় ও তাদের বাসস্থান ধ্বংস হয়। মাটি দূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। দূষিত মাটিতে উৎপন্ন ফসল খাদ্য হিসাবে গ্রহণের ফলে মানুষ ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

(৪) শব্দ দূষণ

মাইকিং করে শব্দ দূষণ

শব্দ দূষণ মানুষ ও জীবজন্তুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে। বিনা প্রয়োজনে হর্ন বাজিয়ে, উচ্চস্বরে গান বাজিয়ে এবং লাউড স্পিকার বা মাইক বাজিয়ে মানুষ শব্দ দূষণ করছে। কলকারখানায় বড় বড় যন্ত্রপাতির ব্যবহারও শব্দ দূষণের কারণ। শব্দ দূষণ মানুষের মানসিক ও শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। অবসন্নতা, শ্রবণ শক্তি হ্রাস, ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি, কর্মক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি সমস্যা শব্দ দূষণের ফলে হয়ে থাকে। আমরা যখন তখন হর্ন না বাজিয়ে এবং উচ্চ শব্দ সৃষ্টি না করে শব্দ দূষণ রোধ করতে পারি।

গাড়ির হর্ন বাজিয়ে শব্দ দূষণ

আলোচনা

◆ **নিচে দেখানো ছকের মতো একটি ছক তৈরি করি।**

বিভিন্ন প্রকার দূষণ	দূষণের কারণ	দূষণের প্রভাব
বায়ু দূষণ		
পানি দূষণ		
মাটি দূষণ		
শব্দ দূষণ		

২. বিভিন্ন প্রকার দূষণের কারণ ও প্রভাব ছকে লিখি।

৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ

প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা এবং যথাযথ ব্যবহারই হচ্ছে **পরিবেশ সংরক্ষণ** ।

প্রশ্ন : আমরা কীভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি ?

কাজ : পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমরা যা করব

কী করতে হবে :

১. নিচের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

আমরা কী করতে পারি?

২. আমরা কীভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি তার একটি তালিকা ছকে তৈরি করি।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি ।

সারসংক্ষেপ

বিদ্যুৎ বা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারি। কাজ শেষে বাতি নিভিয়ে রেখে আমরা বিদ্যুৎ অপচয় রোধ করতে পারি। গাড়িতে চড়ার পরিবর্তে পায়ে হেঁটে বা সাইকেল ব্যবহার করে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে, পুনর্ব্যবহার করে ও রিসাইকেল করেও আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি। কারখানার বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ, তেল ইত্যাদি পরিবেশে ফেলার পূর্বে পরিশোধন করতে পারি। মাটি, পুকুর বা নদীতে ময়লা ফেলা থেকে বিরত থাকতে পারি। ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে এবং গাছ লাগিয়ে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি। পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চলাচল করা

গাছ লাগানো

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) কোনটি বায়ু দূষণের কারণ ?

ক. কীটনাশকের ব্যবহার
খ. কলকারখানার ধোঁয়া
গ. উচ্চ শব্দে গান বাজানো
গ. রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ

২) কোনটি পানি দূষণের ফলে হয় ?

ক. শ্রবণ শক্তি হ্রাস
খ. ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি
গ. ডায়রিয়া
ঘ. মাটির উর্বরতা হ্রাস

৩) মাটি দূষণের কারণ কোনটি?

ক. পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি
খ. চাষাবাদে যন্ত্রপাতির ব্যবহার
গ. কীটনাশকের ব্যবহার
ঘ. মাটির উর্বরতা হ্রাস

৪) পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় কোনটি?

ক. অনবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করা
খ. মোটর গাড়ি ব্যবহার করা
গ. জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করা
ঘ. রিসাইকেল করা

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) পরিবেশ দূষণ বলতে কী বোঝায় ?
২) বায়ু দূষণের ফলে কী হয় ?
৩) পরিবেশের দূষণগুলো কী কী?
৪) পরিবেশ দূষণের উৎসসমূহ কী ?
৫) পরিবেশ সংরক্ষণের ৫টি উপায় লিখি।

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ ব্যাখ্যা করি।
২) শব্দ দূষণ কী? শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব কী?
৩) পরিবেশ সংরক্ষণ কী ? আমরা কীভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি?
৪) মাটি দূষণ কেন মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ?
৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কেন পরিবেশ দূষিত হয় ?
৬) মাটি এবং পানি দূষণের সাদৃশ্য কোথায় ?

অধ্যায় ৩

জীবনের জন্য পানি

আমাদের চারপাশ ঘিরে আছে পানি। প্রাকৃতিক উৎস যেমন– বৃষ্টিপাত, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি থেকে আমরা পানি পাই। মানুষের তৈরি উৎস যেমন– দিঘি, পুকুর, কূপ, নলকূপ ইত্যাদি থেকেও পানি পাওয়া যায়। পানি ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। তাই পানির অপর নাম জীবন।

পানির প্রাকৃতিক উৎস

মানুষের তৈরি পানির উৎস

১. উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য পানি

প্রশ্ন : উদ্ভিদ ও প্রাণীর কেন পানি প্রয়োজন ?

কাজ : পানির ব্যবহার

কী করতে হবে :
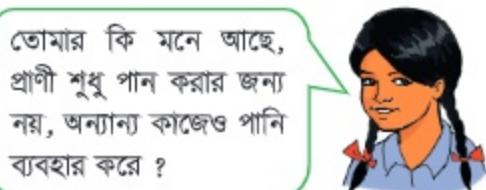
১. নিচের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

	কীভাবে পানি ব্যবহার করে
উদ্ভিদ	
প্রাণী	

২. উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে পানি ব্যবহার করে ছকে তার একটি তালিকা তৈরি করি।
৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

প্রাণী পানি পান করে কিন্তু উদ্ভিদ পানি পান করে না। তাহলে উদ্ভিদ কীভাবে পানি ব্যবহার করে ?

তোমার কি মনে আছে, প্রাণী শুধু পান করার জন্য নয়, অন্যান্য কাজেও পানি ব্যবহার করে ?

সারসংক্ষেপ

জীবের জন্য পানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পানি ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না।
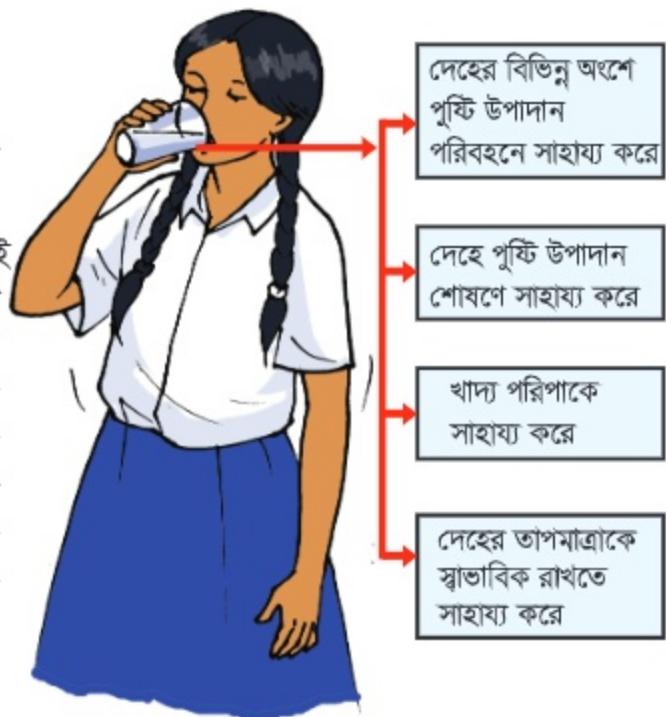
উদ্ভিদ

উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য পানি প্রয়োজন । উদ্ভিদের দেহের প্রায় ৯০ ভাগ পানি। উদ্ভিদ খাদ্য তৈরিতেও পানি ব্যবহার করে। উদ্ভিদ মূলের মাধ্যমে মাটি থেকে পানির সাহায্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান শোষণ করে। এছাড়া পুষ্টি উপাদান কাণ্ড ও অন্যান্য অংশে পরিবহন করতে পানির প্রয়োজন হয়। প্রচণ্ড গরমে পানি উদ্ভিদকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে।

খাদ্য তৈরিসহ নানা কাজে উদ্ভিদ পানি ব্যবহার করে

প্রাণী

বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীদেরও পানি প্রয়োজন। মানবদেহের ৬০–৭০ ভাগ পানি। পানি ছাড়া কোনো প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারে না। আমরা যখন খাদ্য গ্রহণ করি তখন পানি সেই খাদ্য **পরিপাকে** সাহায্য করে। পুষ্টি উপাদান শোষণ ও দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গে পরিবহনের জন্য পানি প্রয়োজন। পানি আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের পানি প্রয়োজন

২. পানি চক্র

(১) পানির অবস্থার পরিবর্তন

আমরা কি কখনো সকালে ঘাসের উপর বিন্দু বিন্দু পানি জমে থাকতে দেখেছি? এই পানির বিন্দুগুলো কোথা থেকে আসে ?

ঘাসের উপর বিন্দু বিন্দু পানি

অনুমান করতে পার পানির বিন্দুগুলো কোথা থেকে আসে?

প্রশ্ন : পানির ফোঁটাগুলো কীভাবে তৈরি হয় ?
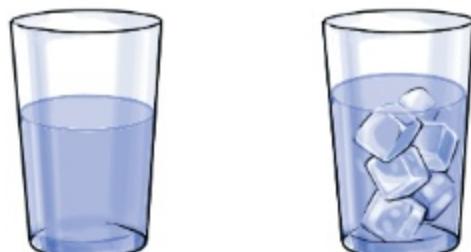
কাজ : গ্লাসের গায়ে পানির বিন্দু

কী করতে হবে :

১. দুইটি পরিষ্কার গ্লাস, পানি ও বরফ নিই।

২. নিচের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

ক. কক্ষ তাপমাত্রার পানি	খ. বরফ দেওয়া পানি

৩. দুইটি গ্লাসেই কক্ষ তাপমাত্রার পানি ঢালি এবং একটিতে কয়েক খণ্ড বরফ নিই।

গ্লাস ক

গ্লাস খ

৪. কিছুক্ষণ পর গ্লাস দুইটির বাইরের পৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করি এবং ছকে তার ছবি আঁকি।

৫. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

ফলাফল

আমরা গ্লাস খ এর বাইরের পৃষ্ঠে পানির ফোঁটা দেখতে পেলাম। অপরদিকে, গ্লাস ক এর বাইরের পৃষ্ঠে কোনো পানির ফোঁটা দেখতে পেলাম না।

আলোচনা

◆ **ফলাফলের ভিত্তিতে নিচের বিষয়গুলো চিন্তা করি**

১. দুইটি গ্লাসের মধ্যে পার্থক্য কী ?

২. পানির ফোঁটাগুলো কোথা থেকে এলো বা কেমন করে এলো?

সারসংক্ষেপ

রাতে ঘাস, গাছপালা ইত্যাদির উপর যে বিন্দু বিন্দু পানি জমে তাকে **শিশির** বলে। বায়ু যখন ঠান্ডা কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তখন বায়ুতে থাকা জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়ে পানির ফোঁটা হিসেবে জমা হয়।

বাতাসের জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়ে পানিতে পরিণত হয়। বাষ্প থেকে তরলে পরিণত হওয়াকে **ঘনীভবন** বলে। পানিকে যখন তাপ দেওয়া হয়, তখন তা জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াই হচ্ছে **বাষ্পীভবন**।
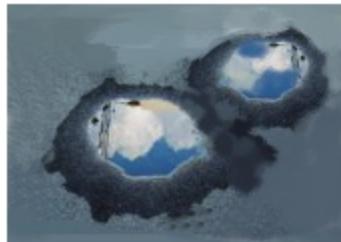
মাকড়সার জালে শিশির

তাপ প্রয়োগ ও ঠান্ডা করার মাধ্যমে পানি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। বরফকে তাপ দিলে তা পানিতে পরিণত হয়। পানিকে তাপ দিলে তা জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্পকে ঠান্ডা করা হলে তা ঘনীভূত হয়ে পানিতে পরিণত হয়। যখন পানিকে শীতল করা হয়, তখন তা জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়। পানির রূপ তিনটি: বরফ (কঠিন), পানি (তরল), বাষ্প।

পানির অবস্থার পরিবর্তন

(২) পানি চক্র কী ?

বৃষ্টির পর মাটিতে পানি জমে থাকতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর সেই পানি অদৃশ্য হয়ে যায়। পানি কোথায় চলে যায় ?

মাটিতে জমে থাকা পানি কোথায় চলে যায় আমরা কি অনুমান করতে পারি ?

প্রশ্ন : পানি কোথা থেকে আসে এবং কোথায় চলে যায় ?

কাজ : **বায়ুতে পানি আছে**
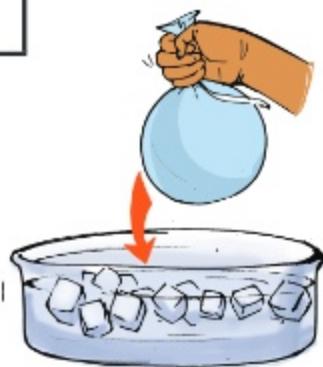
কী করতে হবে :

১. একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং বরফসহ পানি ভর্তি একটি পাত্র নেই।

২. নিচের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

ব্যাগের ভিতরের গায়ে যা দেখতে পেলাম

৩. পরিষ্কার প্লাস্টিকের ব্যাগ বায়ু দ্বারা পূর্ণ করি এবং মুখ শক্ত করে বাঁধি।

৪. ব্যাগটি কিছুক্ষণের জন্য বরফসহ পানির পাত্রে ডুবিয়ে রাখি এবং কিছুক্ষণ পর সরিয়ে ফেলি।

৫. ব্যাগের ভেতরে কী পরিবর্তন ঘটতে পারে তা অনুমান করি।

৬. ব্যাগের ভিতরের অংশটি পর্যবেক্ষণ করি এবং ছবি আঁকি।

৭. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

আলোচনা

◆ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিচের বিষয়গুলো চিন্তা করি।

১. ব্যাগের ভেতর কী ঘটছে ? কেন ঘটেছে ?

২. আমরা কি অনুমান করতে পারি বায়ুতে কী আছে ?

সারসংক্ষেপ

পরীক্ষাটি থেকে জেনেছি যে, বায়ুতে জলীয় বাষ্প আছে। ভূপৃষ্ঠের একভাগ ভূমি ও তিনভাগ পানি এবং এই পানির অনেকটাই সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত হয় এবং বায়ুতে মিশে যায়। তার মানে হচ্ছে পানি তরল অবস্থা থেকে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়।

যে প্রক্রিয়ায় পানি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং পুনরায় উৎসে ফিরে আসে তাকে পানি চক্র বলে। এই চক্রের মাধ্যমে সর্বদাই পানির অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। সাগর ও নদীর পানি বাষ্পীভূত হয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পীভূত পানি উপরে উঠে ঠান্ডা ও ঘনীভূত হয়ে পানির বিন্দুতে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির বিন্দু একত্রিত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে। এই মেঘের পানিকণা বড় হয়ে বৃষ্টিপাত হিসেবে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। শীত প্রধান দেশে তুষারও মেঘ থেকেই পড়ে। বৃষ্টির পানি সাধারণত মাটিতে শোষিত হয় অথবা নদীতে গড়িয়ে পড়ে। মাটিতে শোষিত পানি ভূগর্ভস্থ পানি হিসেবে জমা থাকে। নদীতে গড়িয়ে পড়া পানি সমুদ্রে প্রবাহিত হয় এবং বাষ্পীভূত হয়ে আবার বায়ুতে ফিরে যায়।

পানি চক্র

৩. পানি দূষণ

প্রাকৃতিক পানিতে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ মিশে পানি দূষিত হয়। পানি দূষণ জীবের জন্য ক্ষতিকর।

গৃহকর্মের কারণে পানি দূষণ

পানি দূষণের কারণ

মানুষের কর্মকাণ্ড পানি দূষণের প্রধান কারণ। কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক, কলকারখানার রাসায়নিক দ্রব্য, গৃহস্থালির বর্জ্যের মাধ্যমে পানি দূষিত হয়। এছাড়া নদী বা পুকুরে গরু-ছাগল গোসল করানো এবং কাপড়চোপড় ধোয়ার কারণেও পানি দূষিত হয়। পলিথিন ও প্লাস্টিকজাতীয় সামগ্রী পানিতে ফেলার কারণেও পানি দূষিত হয়।

ময়লা আবর্জনা কুড়িয়ে পানি দূষণ রোধ

পানি দূষণের প্রভাব

পানি দূষণের ফলে জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে এবং জলজ খাদ্য শৃঙ্খলের ব্যাঘাত ঘটছে। এই দূষণের প্রভাব মানুষের উপরও পড়ছে। দূষিত পানি পান করে মানুষ টাইফয়েড, ডায়রিয়া বা কলেরার মতো পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

কীভাবে পানি দূষণ প্রতিরোধ করা যায় ?

কৃষিতে কীটনাশক এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে আমরা পানি দূষণ প্রতিরোধ করতে পারি। এছাড়া রান্নাঘরের ও টয়লেটের বর্জ্য নিষ্কাশন নালায় এবং তেল না ফেলে দূষণ রোধ করতে পারি। পুকুর, নদী, হ্রদ কিংবা সাগরে ময়লা– আবর্জনা না ফেলে পানি দূষণ কমাতে পারি। সমুদ্রসৈকতে পড়ে থাকা ময়লা এবং খাল-বিল কিংবা নদীতে ভাসমান ময়লা আবর্জনা কুড়িয়ে আমরা পানি পরিষ্কার রাখতে পারি।

আলোচনা

- **আমরা কীভাবে পানি দূষণ প্রতিরোধ করতে পারি ?**

  ১. পানি দূষণ প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কী তা খাতায় লিখি।

  ২. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

৪. নিরাপদ পানি

সুস্থ থাকার জন্য শুধু উদ্ভিদ ও প্রাণীই নয়, মানুষেরও নিরাপদ পানি প্রয়োজন।

প্রশ্ন : আমরা কীভাবে নিরাপদ পানি পেতে পারি ?

কাজ : সরল ছাঁকনি

কী করতে হবে :

১. কোনো পুকুর বা নদী থেকে সংগ্রহ করা ময়লা পানি, প্লাস্টিকের বোতল, পাতলা কাপড়, বালি, ছোট ছোট পাথরের টুকরো এবং পরিষ্কার গ্লাস নিই।

২. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

ছাঁকনের পূর্বে	ছাঁকনের পরে

৩. পুকুর বা ডোবা থেকে সংগ্রহ করা ময়লা পানি পর্যবেক্ষণ করে বাম পাশের কলামে ছবি আঁকি।

৪. ডান পাশের ছবির মতো করে একটি পানির ফিল্টার প্রস্তুত করি।

৫. ফিল্টারে ময়লা পানি ঢালি।

৬. ফিল্টার থেকে নির্গত পানি পর্যবেক্ষণ করি এবং ছকের ডান পাশের কলামে ছবি আঁকি।

৭. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।!

প্লাস্টিকের বোতলের ধারালো প্রান্তে হাত কেটে যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন পানিই হলো নিরাপদ পানি। কিছু পানি মানুষের জন্য নিরাপদ। যেমন– নলকূপের পানি। আবার কিছু পানি মানুষের পানের জন্য নিরাপদ নয়। যেমন– পুকুর বা নদীর পানি।

তাই পান করা এবং রান্নার কাজে ব্যবহার করার পূর্বে পানি নিরাপদ করা প্রয়োজন। মানুষের ব্যবহারের জন্য পানিকে গ্রহণযোগ্য এবং নিরাপদ করার ব্যবস্থাই হলো **পানি বিশুদ্ধকরণ**।

পরিষ্কার কিন্তু অনিরাপদ পানি

নিচে পানি নিরাপদ করার কিছু উপায় বর্ণনা করা হলো–

ছাঁকন

ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে পানি পরিষ্কার করার প্রক্রিয়াই হলো **ছাঁকন**। পাতলা কাপড় বা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে পানি পরিষ্কার করা যায়। তবে এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পানি পরিষ্কার হলেও তা জীবাণুমুক্ত নয়। তাই নিরাপদ পানির জন্য এই পানিকে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

থিতানো

একটি কলস বা পাত্রে নদী বা পুকুরের পানি নিয়ে রেখে দেই। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে পাত্রের তলায় তলানি জমেছে। উপরের অংশের পানি পরিষ্কার হয়েছে। পানিতে থাকা ময়লা যেমন– বালি, কাদা ইত্যাদি সরানোর এই প্রক্রিয়াই হলো থিতানো।

ফুটানো

পানি জীবাণুমুক্ত করার একটি ভালো উপায় হলো ফুটানো। জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানির জন্য ২০ মিনিটের বেশি সময় ধরে পানি ফুটাতে হবে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পানি বিশুদ্ধকরণ

অনেক সময় বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে পানি ফুটানো সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে ফিটকিরি, ব্লিচিং পাউডার, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ইত্যাদি পরিমাণমতো মিশিয়ে আমরা পানি নিরাপদ করতে পারি। তবে মনে রাখতে হবে আর্সেনিকযুক্ত পানি এ সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিরাপদ করা যায় না।

ছাঁকন প্রক্রিয়া

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) উদ্ভিদের পুষ্টি শোষণের জন্য কোনটি প্রয়োজন ?

ক. পানি　　খ. মাটি

গ. আলো　　ঘ. বায়ু

২) কোনটি পানি দূষণের কারণ ?

ক. ধোঁয়া　　খ. ক্ষতিকর গ্যাস

গ. হর্ন বাজানো　　ঘ. নর্দমার বর্জ্য

৩) পানিতে মিশে থাকা বালি, কাদা ইত্যাদি সরানোর প্রক্রিয়াকে কী বলে ?

ক. ছাঁকন　　খ. থিতানো

গ. ফুটানো　　ঘ. ঘনীভবন

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) পানিচক্র কী ?

২) পানি দূষণ প্রতিরোধের ৩টি উদাহরণ দিই।

৩) অনিরাপদ পানি থেকে নিরাপদ পানি পাওয়ার চারটি উপায় লিখি।

৪) বৃষ্টির পর মাটিতে পানি জমা হয়। কিছুক্ষণ পর সেই পানি অদৃশ্য হয়ে যায়। ওই পানি কোথায় যায় ?

৫) পানির তিনটি অবস্থা কী কী ?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) বরফসহ পানির গ্লাসের বাইরের পৃষ্ঠ কেন ভিজে যায় তা ব্যাখ্যা করি।

২) পানিচক্র ব্যাখ্যা কর।

৩) জীবের কেন পানি প্রয়োজন ?

৪) বাতাসে পানি আছে তা আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি?

৫) পুকুরের পানি থেকে আমরা কীভাবে নিরাপদ পানি পেতে পারি?

৬) ঠান্ডা পানির গ্লাসের গায়ে লেগে থাকা পানির কণা এবং শিশির কেন একই রকম ?

অধ্যায় ৪

বায়ু

জীবের জন্য বায়ু খুব গুরুত্বপূর্ণ। বায়ু ছাড়া জীব বেঁচে থাকতে পারে না। উদ্ভিদ বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে। আবার শ্বাস গ্রহণের জন্য প্রাণীর বায়ুর অক্সিজেন প্রয়োজন।

১. দৈনন্দিন জীবনে বায়ু

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য বায়ু প্রয়োজন। এছাড়াও দৈনন্দিন নানা কাজে মানুষ বায়ু ব্যবহার করে থাকে।

প্রশ্ন : মানুষ দৈনন্দিন জীবনে কী কী কাজে বায়ু ব্যবহার করে?
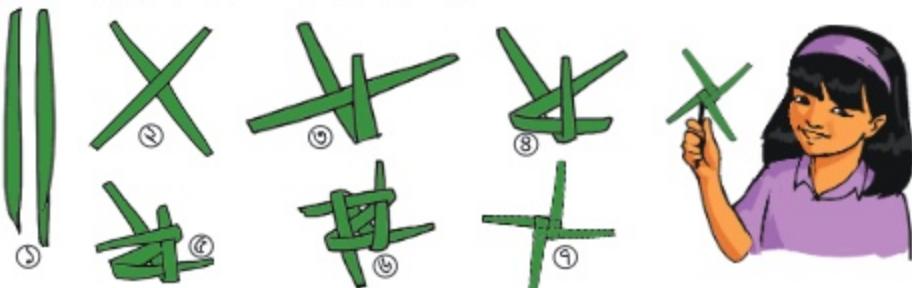
কাজ : বায়ুপ্রবাহ কীভাবে কাজ করে ?

কী করতে হবে :

১. একটি নারিকেল বা তালের পাতা ও পিন নিই।
২. নিচের ছবি দেখে একটি চরকা তৈরি করি।

৩. চরকাটিকে একটি পিনের মাথায় বসিয়ে বায়ুর বিপরীত দিকে ধরি।
৪. চরকাটির কী ঘটে লক্ষ করি।
৫. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

আলোচনা

◆ পর্যবেক্ষণ থেকে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করি।

১. চরকাটির কী ঘটে ? কেন ঘটে?
২. অনুমান করতে পার বায়ুপ্রবাহ আর কী কী করতে পারে ?
৩. ডান পাশের ছকে দৈনন্দিন জীবনে বায়ুর ব্যবহারের একটি তালিকা তৈরি কর।

দৈনন্দিন জীবনে বায়ুপ্রবাহের ব্যবহার

সারসংক্ষেপ

মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্নভাবে বায়ু ব্যবহার করে।

বায়ুপ্রবাহের ব্যবহার

কাজটি থেকে আমরা দেখলাম, বায়ুপ্রবাহ চরকা ঘুরাতে পারে। বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে এভাবে বড় চরকা বা টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। দৈনন্দিন জীবনে বায়ুপ্রবাহের নানাবিধ ব্যবহার রয়েছে। মানুষ শরীর ঠান্ডা রাখতে হাতপাখা বা বৈদ্যুতিক পাখার বায়ুপ্রবাহ ব্যবহার করে। বায়ুপ্রবাহ ব্যবহার করে নদীতে পাল তোলা নৌকা চলে। কোনো ভেজা বস্তুকে শুকানোর জন্য বায়ুপ্রবাহ ব্যবহার করা হয়। বায়ুপ্রবাহ ভেজা বস্তু থেকে দ্রুত পানি সরিয়ে নিতে সাহায্য করে। আমরা ভেজা কাপড় শুকানোর জন্য খোলা জায়গায় বাতাসে মেলে রাখি। আবার ভেজা চুল শুকানোর জন্য হেয়ার ড্রায়ারের বায়ুপ্রবাহ ব্যবহার করি।

ড্রাইয়ারের মাধ্যমে ভেজা চুল শুকানো

বাতাসে ভেজা কাপড় শুকানো

বায়ুর ব্যবহার

ফুটবল, গাড়ি, রিকসা বা সাইকেলের টায়ার ইত্যাদি ফোলানোর জন্য মানুষ বায়ু ব্যবহার করে। এছাড়া মানুষ বায়ুর উপাদানগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। শ্বাসকষ্টের রোগী, ডুবুরি এবং পর্বতারোহীকে **অক্সিজেন সিলিন্ডারের** মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। ইউরিয়া সার তৈরিতে এবং প্যাকেট বা টিনের কৌটায় বিভিন্ন খাদ্য যেমন–মাছ, মাংস , চিপস ইত্যাদি সংরক্ষণে বায়ুর নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন কোমল পানীয়তে ঝাঁঝালো ভাব ধরে রাখার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়। আগুন নেভানোর জন্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রেও কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়।

এভাবেই বায়ু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সিলিন্ডারে অক্সিজেন ব্যবহার

কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যবহার

২. বায়ু দূষণ

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, বায়ু দূষিত হচ্ছে। কীভাবে বায়ু দূষিত হচ্ছে ? বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা কেন জরুরি ? বায়ু দূষণমুক্ত রাখতে আমরা কী কী করতে পারি ?

প্রশ্ন : বায়ু দূষণের কারণ ও প্রভাবগুলো কী কী ?

কাজ : বায়ু দূষণের কারণ ও প্রভাব

কী করতে হবে :

১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

বায়ু দূষণের কারণ	বায়ু দূষণের প্রভাব

২. বায়ু দূষণের কারণ ও প্রভাবগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি।
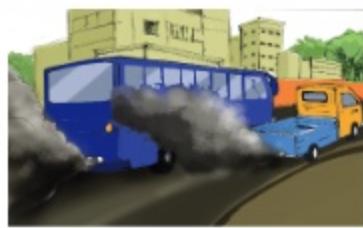
৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যেমন– রাসায়নিক পদার্থ, গ্যাস, ধূলিকণা, ধোঁয়া অথবা দুর্গন্ধ বায়ুতে মিশে বায়ু দূষিত করে। এই দূষণ জীব ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে।

বায়ু দূষণের কারণ

মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বায়ু দূষণের একটি বড় কারণ। বিশেষ করে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুতে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস নির্গত হয়। কলকারখানা ও যানবাহন থেকে এ সকল গ্যাস বায়ুতে আসে। গাছপালা পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন ধোঁয়া থেকেও বায়ু দূষিত হয়। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা ও মলমূত্র ত্যাগের কারণে বায়ুতে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং বায়ু দূষিত হয়।

বায়ু দূষণের বিভিন্ন কারণ

মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব

বায়ু দূষণজনিত রোগ

বায়ু দূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে মানুষ ফুসফুসের ক্যান্সার, শ্বাসজনিত রোগ, হৃদরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। পরিবেশের উপরও বায়ু দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস ছড়ায়। এই সকল গ্যাস বায়ুতে বেড়ে যাওয়ার ফলে **পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি** পাচ্ছে ও **এসিড বৃষ্টি** হচ্ছে। কলকারখানার ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের গ্যাস মেঘের সাথে মিশে যাওয়ার ফলে এসিড বৃষ্টি তৈরি হয়। এসিড বৃষ্টির ফলে জীবের ক্ষতি হতে পারে বা জীব মারা যেতে পারে।

কীভাবে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা যায়

রিসাইকেল

শক্তির ব্যবহার কমিয়ে আমরা জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার কমাতে পারি। যেমন– বাতি বন্ধ রেখে, গাড়ি ব্যবহারের পরিবর্তে পায়ে হেঁটে বা সাইকেল ব্যবহার করে ইত্যাদি। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে, পুনর্ব্যবহার করে ও রিসাইকেল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা দূষণ প্রতিরোধ করতে পারি। ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে এবং গাছ লাগানোর মাধ্যমেও বায়ু দূষণমুক্ত রাখতে পারি।

আলোচনা

কী করব?

◆ **আমরা কীভাবে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করতে পারি ?**

১. ডান পাশে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি ?

২. ছকে বায়ু দূষণ প্রতিরোধে কী কী করব তার একটি তালিকা তৈরি করি।

৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দাও।

১) চিপসের প্যাকেটে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয় ?

ক. অক্সিজেন | খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড
গ. নাইট্রোজেন | ঘ. জলীয় বাষ্প

২) পর্বতারোহীরা সিলিন্ডারে কোন গ্যাস নিয়ে যান ?

ক. অক্সিজেন | খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড
গ. নাইট্রোজেন | ঘ. জলীয় বাষ্প

৩) কোন গ্যাস পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী ?

ক. অক্সিজেন | খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড
গ. নাইট্রোজেন | ঘ. হাইড্রোজেন

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) মানুষ কীভাবে বায়ুপ্রবাহকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে ?

২) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ কী ?

৩) বায়ু দূষণ প্রতিরোধের তিনটি উপায় লিখি।

৪) বায়ু দূষণের কারণ কী ?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) ভেজা কাপড় যত দ্রুত সম্ভব শুকানো প্রয়োজন। কিন্তু বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঘরের ভেতর কীভাবে আমরা দ্রুত কাপড় শুকাতে পারি?

২) রিসাইকেল প্রক্রিয়া কীভাবে বায়ু দূষণ কমাতে পারে ?

৩) কী কী কারণে বায়ু দূষিত হয়? মানুষ কীভাবে বায়ু দূষণ করছে?

অধ্যায় ৫

শক্তি ও পদার্থ

১. শক্তি

কোনো কাজ করার সামর্থ্যই হলো শক্তি। আমরা সকল কাজেই শক্তি ব্যবহার করি।

(১) আমাদের চারপাশের শক্তিসমূহ

প্রশ্ন : শক্তি কী ?

পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে এবং সাইকেল চালাতে আমরা শক্তি ব্যবহার করি। খাবার রান্না করতে কিংবা কম্পিউটার চালাতে আমাদের শক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তি ব্যবহার করেই গাড়ি চলে।

শক্তির রূপ

শক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন–

শক্তির বিভিন্ন রূপ

শক্তির রূপ	শক্তির রূপের ব্যবহার	উদাহরণ
বিদ্যুৎ শক্তি	বৈদ্যুতিক বাতি এবং পাখা, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি চালাতে এই শক্তি ব্যবহৃত হয়।	
যান্ত্রিক শক্তি	কোনো চলমান বস্তুর শক্তি হলো এক ধরনের যান্ত্রিক শক্তি। যেমন– বায়ুপ্রবাহ একটি যান্ত্রিক শক্তি। কারণ এটি বায়ুকল চালাতে পারে। এছাড়া, চলমান গাড়ির শক্তিও যান্ত্রিক শক্তি।	
আলোক শক্তি	বিভিন্ন ধরনের আলো সৃষ্টি করতে সক্ষম যে শক্তি আমাদের দেখতে সাহায্য করে তাই আলোক শক্তি। এটি স্বচ্ছ বস্তুর ভেতর দিয়ে চলতে পারে। সূর্য, বৈদ্যুতিক বাতি, মোমবাতি ইত্যাদি থেকে আমরা আলোক শক্তি পাই।	
শব্দ শক্তি	শব্দ শক্তি হলো এমন একটি শক্তি যা আমাদের শুনতে সাহায্য করে। বস্তুর কম্পন থেকে শব্দের সৃষ্টি হয়। এটি বায়ু বা অন্য কিছুর ভেতর দিয়ে চলতে পারে। গান শুনতে আমরা এই শক্তি ব্যবহার করি।	
তাপ শক্তি	তাপ এক প্রকার শক্তি। চুলার আগুন, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ইত্যাদি থেকে আমরা তাপ শক্তি পাই।	
রাসায়নিক শক্তি	খাবার, জ্বালানি তেল, কয়লা ইত্যাদিতে রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে।	

শক্তির উৎস

তোমরা দেখেছ নানা কাজে, নানাভাবে শক্তি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা শক্তি পাই। এই শক্তি কখনো আসছে কয়লা, তেল বা খাবার থেকে। কখনো আসছে বায়ুপ্রবাহ বা পানির স্রোত থেকে। আবার কখনো ব্যাটারি বা জেনারেটর থেকে। এই সব উৎস থেকেই আমরা তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, শব্দ ইত্যাদি শক্তি পাই। খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখবে এ সমস্ত শক্তিরই মূল উৎস সূর্য।

আলোচনা

◆ **চলো আমরা আমাদের চারপাশের শক্তিসমূহ খুঁজে বের করি।**
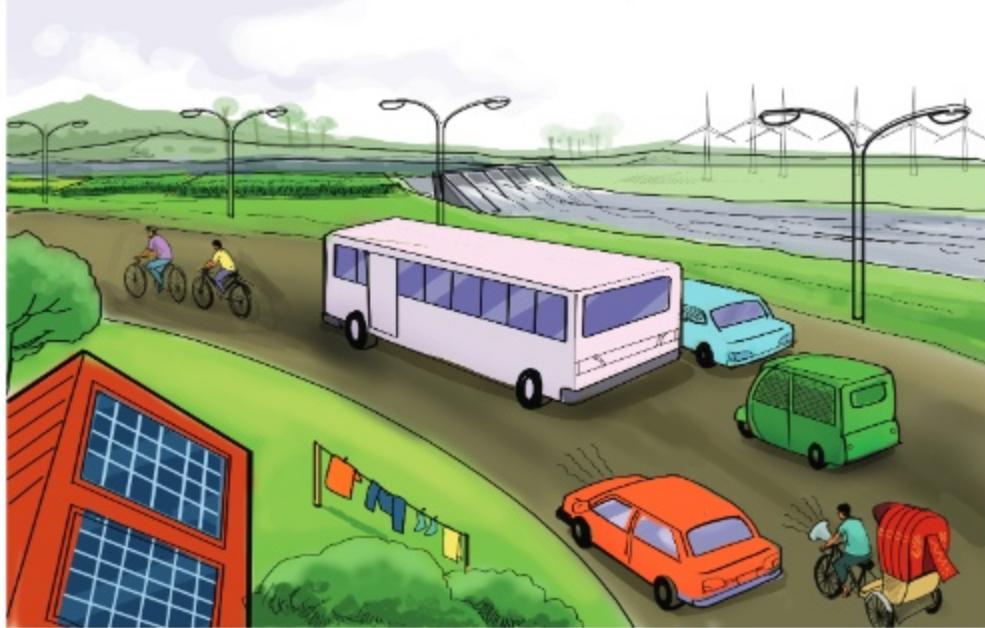
১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

যেভাবে শক্তি ব্যবহৃত হয়	শক্তির রূপ	শক্তির উৎস

২. নিচের ছবিতে শক্তি কী কী উপায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে তা খুঁজে বের করে শক্তির ব্যবহার, এর রূপ এবং উৎসগুলো ছকে লিখি।

৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

(২) শক্তির রূপান্তর

প্রশ্ন : শক্তি কীভাবে রূপান্তরিত হয় ?
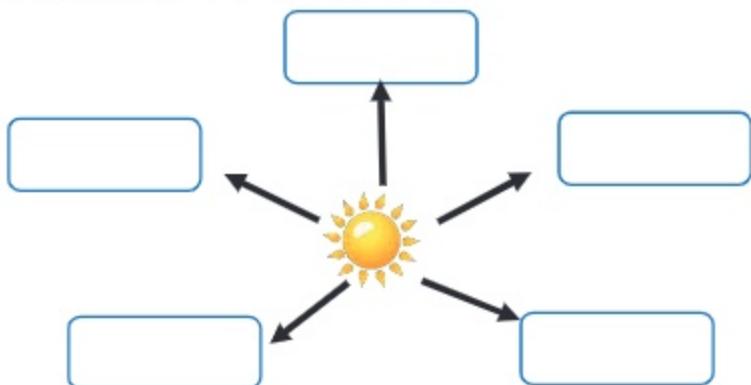
কাজ : শক্তির রূপান্তর

কী করতে হবে :

১. নিচের রেখাচিত্রের মতো একটি রেখাচিত্র আঁকি।

২. নিচের ছবি দেখে সূর্য থেকে পাওয়া শক্তির বিভিন্ন রূপ উপরের রেখাচিত্রে বসাই।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। শক্তির রূপের এই পরিবর্তনই হলো **শক্তির রূপান্তর**। সূর্য থেকে পাওয়া শক্তি সৌরশক্তি নামে পরিচিত। সৌরশক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে আলো ও তাপ হিসেবে পাই। এটি আবার বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। যখন উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে তখন সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। প্রাণী যখন খাদ্য হিসেবে এই উদ্ভিদ গ্রহণ করে তখন এই রাসায়নিক শক্তি তাপ এবং যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সৌর প্যানেল সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। যখন আমরা টেলিভিশন চালাই তখন এই বিদ্যুৎ শক্তি আলোক, তাপ এবং শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

আলোচনা

◆ **আমাদের চারপাশে শক্তির রূপান্তর**

১. আমাদের চারপাশে শক্তির রূপান্তরসমূহ খুঁজে বের করে তালিকা তৈরি করি।
২. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

(৩) শক্তি সঞ্চালন

প্রশ্ন : শক্তি কীভাবে সঞ্চালিত হয় ?

কাজ : তাপ সঞ্চালন

কী করতে হবে :

১. জমাট বাঁধা ঘি/ডালডা, পাতলা ধাতব চামচ, ছোট পুঁতি, কাচের বাটি বা চায়ের মগ, স্টপওয়াচ বা হাতঘড়ি এবং গরম পানি নিই।

২. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

	কোনটি কখন পড়বে (প্রথমে, মাঝে ও শেষে)	কখন পড়েছে
পুঁতি 'ক'		
পুঁতি 'খ'		
পুঁতি 'গ'		

৩. সমপরিমাণ ঘি বা ডালডা ব্যবহার করে পুঁতি তিনটি চামচের হাতলে আটকাই।

৪. কাচের বাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম পানি ঢালি এবং তাতে আস্তে আস্তে চামচটির অগ্রভাগ ডুবাই।

৫. কোন পুঁতিটি আগে পড়বে তা অনুমান করে উপরের ছকে লিখি।

৬. ক, খ এবং গ পুঁতি চামচ থেকে কখন পড়েছে তার সময় পরিমাপ করে ছকে লিখি।

৭. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

খালি হাতে গরম বাটি এবং চামচ স্পর্শ করলে হাত পুড়ে যেতে পারে।

আলোচনা

➢ উপরের পরীক্ষাটির ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করি।

- কোন পুঁতিটি প্রথমে পড়েছে? কেন ?
- ধাতব চামচের মতো কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ কীভাবে সঞ্চালিত হলো ?

সারসংক্ষেপ

শক্তি বিভিন্ন উপায়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়।

(১) তাপ সঞ্চালন

উচ্চ তাপমাত্রার স্থান থেকে নিম্ন তাপমাত্রার স্থানে তাপের প্রবাহই হলো তাপ সঞ্চালন। পরিবহন, পরিচলন এবং বিকিরণ এই তিন উপায়ে তাপ সঞ্চালিত হয়।

পরিবহন

কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে **পরিবহন** পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয়। আমরা যদি গরম পানির পাত্রে একটি ধাতব চামচের অগ্রভাগ ডুবাই তবে খুব দ্রুতই চামচটির হাতল গরম হয়ে উঠে। এর কারণ, গরম পানির তাপ চামচের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে চামচের গরম অংশ থেকে ঠান্ডা অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

তাপের পরিবহন

পরিচলন

তরল এবং বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে **পরিচলন** পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয়। যখন আমরা কোনো পানির পাত্রকে চুলায় গরম করি তখন এর নিচের অংশের পানি প্রথমে গরম হয়ে উপরে উঠে আসে। আর পাত্রের উপরের অংশের পানির তাপমাত্রা কম থাকায় তা নিচে নেমে আসে যা আবার গরম হয়ে উপরের দিকে উঠে আসে। এভাবে তাপ পাত্রের পানির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

তাপের পরিচলন

বিকিরণ

তাপের বিকিরণ

যে প্রক্রিয়ায় তাপ শক্তি কোনো **মাধ্যম** ছাড়াই উৎস থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাই **বিকিরণ**। কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে পরিবহন এবং তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপ কঠিন, তরল এবং বায়বীয় মাধ্যম ছাড়াই সঞ্চালিত হয়।

এ কারণে পৃথিবী থেকে সূর্য লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরে হলেও আমরা সূর্যের তাপ পাই। আগুন কিংবা বৈদ্যুতিক বাতি থেকেও এ প্রক্রিয়ায় তাপ পাওয়া যায়।

(২) আলোর সঞ্চালন

আলো মাধ্যম ছাড়া সঞ্চালিত হতে পারে

আলো শক্তির এমন একটি রূপ যা আমাদের দেখতে সাহায্য করে। আলো বিকিরণ পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। কঠিন, তরল এবং বায়বীয় মাধ্যম ছাড়াই আলো সঞ্চালিত হতে পারে। আলোর সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। বিকিরণ প্রক্রিয়াতেই চাঁদ, তারা এবং সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে আসে।

আলোচনা

- **চলো কোথায় এবং কীভাবে তাপ সঞ্চালিত হয় তা খুঁজে বের করি।**
  ১. নিচের ছবিতে কোথায় এবং কীভাবে তাপ সঞ্চালিত হচ্ছে তা খুঁজে বের করি।
  ২. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

(৪) শক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং সাশ্রয়

প্রশ্ন : আমরা কীভাবে শক্তির সাশ্রয় করতে পারি?

শক্তির সাশ্রয় কেন জরুরি ?

আমরা প্রতিদিন নানা কাজে শক্তি ব্যবহার করি। তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের উপরই আমরা বেশি নির্ভরশীল। এসকল শক্তির উৎস ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হলে তা আর সহজে তৈরি হয় না। তাই আমাদের শক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। শক্তির অপচয় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর । শক্তির যথাযথ ব্যবহার করে আমরা শক্তির অপচয় রোধ করতে পারি এবং পরিবেশ দূষণ কমাতে পারি।

কীভাবে শক্তির সাশ্রয় করব

শক্তি সাশ্রয়ের কিছু উপায় নিচে দেওয়া হলো–

- ব্যবহারের পর বৈদ্যুতিক বাতি এবং যন্ত্রপাতিসমূহ বন্ধ রাখা।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরে ফ্রিজের দরজা খোলা না রাখা।
- বাড়িতে ছায়ার ব্যবস্থা করার জন্য গাছ লাগিয়ে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহার কমানো।
- বৈদ্যুতিক বাতি না জ্বালিয়ে পর্দা সরিয়ে দিনের আলো ব্যবহার করা।
- গাড়িতে চড়ার বদলে যথাসম্ভব পায়ে হাঁটা বা সাইকেল ব্যবহার করা।

দ্রুত ফ্রিজের দরজা বন্ধ করা

দিনের আলোর ব্যবহার

আলোচনা

◆ আমরা কীভাবে শক্তির সাশ্রয় করতে পারি ?

১. ডান পাশের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।
২. শক্তির সাশ্রয়ের জন্য কী করব তার তালিকা ছকে লিখি।
৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।
৪. শক্তির সাশ্রয়ের জন্য শ্রেণিকক্ষে কিছু নিয়ম তৈরি করি।

শক্তি সাশ্রয়ের উপায়

২. পদার্থের গঠন

যার ওজন আছে এবং জায়গা দখল করে তাই পদার্থ। আমাদের চারপাশে অজস্র পদার্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমনকি বায়ু যা আমরা দেখতে পাই না তাও পদার্থ।

প্রশ্ন : পদার্থ কী দিয়ে তৈরি ?

কাজ : **এক খণ্ড চক গুঁড়া করি !**
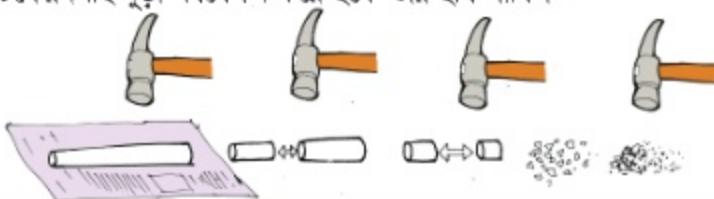
কী করতে হবে :

১. কয়েক খণ্ড চক, খবরের কাগজ এবং একটি হাতুড়ি নিই।

২. নিচের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

এক খণ্ড চক	ভাঙা চক	চকের গুঁড়া

৩. এক খণ্ড চক পর্যবেক্ষণ করি এবং ছকে তার ছবি আঁকি।

৪. খবরের কাগজের উপরে চক খণ্ডটি রেখে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ছোট ছোট টুকরা করি।

৫. ভাঙা চক পর্যবেক্ষণ করি এবং ছকে তার ছবি আঁকি।

৬. হাতুড়ি দিয়ে চকের ছোট টুকরাগুলো আরও ভেঙে মিহি গুঁড়া করি।

৭. চকের মিহি গুঁড়া পর্যবেক্ষণ করে ছকে তার ছবি আঁকি।
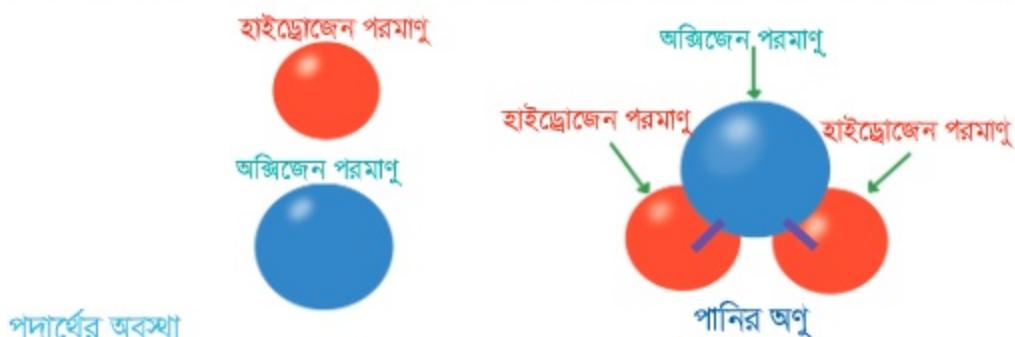
আলোচনা

➢ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করি।

- তুমি কি মনে কর চকের মিহি গুঁড়া এবং চক খণ্ড একই?
- তুমি কি মনে কর চকের মিহি গুঁড়াকে আরও ছোট করা সম্ভব?

সারসংক্ষেপ

যে কোন পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত। এই কণাগুলোকে বলে অণু। এরা এত ছোট যে এদের খালি চোখে দেখা যায় না, এমনকি সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়েও দেখা যায় না। প্রতিটি অণুতে অণুর চেয়েও ক্ষুদ্র এক বা একাধিক কণা থাকে, যাদের বলা হয় পরমাণু। যে পদার্থের অণুতে একই ধরনের এক বা একাধিক পরমাণু থাকে তাকে বলা হয় মৌলিক পদার্থ বা মৌল। ঐ পরমাণুকে বলা হয় ঐ মৌলের পরমাণু। যেমন, সোডিয়াম নামক মৌলের অণুতে সোডিয়ামের একটি পরমাণু থাকে। অক্সিজেন নামক মৌলের অণুতে অক্সিজেনের দু'টি পরমাণু থাকে। আবার, যে পদার্থের অণুতে একাধিক ভিন্ন মৌলের পরমাণু থাকে তাকে বলা হয় যৌগিক পদার্থ বা যৌগ। যেমন পানি নামক যৌগের অণুতে দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।

পানির অণু

পদার্থের অবস্থা

পদার্থ কঠিন, তরল না বায়বীয় অবস্থায় থাকবে তা নির্ভর করে পদার্থের অণুগুলো কীভাবে সাজানো, এদের মধ্যে বন্ধন কেমন, তার উপর। পানি একটি পদার্থ। পানির তিনটি অবস্থা রয়েছে। যথা– বরফ, পানি এবং জলীয় বাষ্প। অসংখ্য পানির অণু দ্বারা পানি গঠিত। এই অণুসমূহ সবসময়ই গতিশীল। কঠিন অবস্থায় অর্থাৎ বরফে পানির অণুসমূহ খুব কাছাকাছি থাকে এবং তাদের বন্ধন অনেক বেশি দৃঢ়। তরল অবস্থায় অর্থাৎ পানিতে পানির অণুসমূহ যথেষ্ট কাছাকাছি থাকলেও অণুগুলোর মাঝে বন্ধন অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়াতে তারা চলাচল করতে পারে। আবার বায়বীয় অবস্থায় অর্থাৎ জলীয় বাষ্পে পানির অণুসমূহ একে অপর থেকে বেশ দূরে অবস্থান করে। বায়বীয় পদার্থের অণুগুলোর মাঝে বন্ধন খুব দুর্বল থাকে। ফলে অণুগুলো দ্রুত গতিতে বেশ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে।

পদার্থের তিন অবস্থা

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✓)দিই।

১) নিচের কোনটি থেকে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়?

ক. বায়ুপ্রবাহ খ. জ্বালানি তেল গ. চুলার আগুন ঘ. তাপ

২) উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করতে কোন শক্তিটি ব্যবহার করে?

ক. শব্দ খ. আলো গ. তাপ ঘ. বিদ্যুৎ

৩) খাদ্যে নিচের কোন শক্তিটি থাকে ?

ক. আলোক শক্তি খ. তাপ শক্তি গ. যান্ত্রিক শক্তি ঘ. রাসায়নিক শক্তি

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) শক্তির ৫টি রূপের নাম লিখি।

২) তাপ সঞ্চালনের তিনটি প্রক্রিয়া কী কী ?

৩) কীভাবে আলো সঞ্চালিত হয় ?

৪) পরমাণু কী ?

৫) গিটার বাজানো হলে কোন ধরনের শক্তি উৎপন্ন হয়?

৩. রচনামূলক প্রশ্ন :

১) যখন টিভি চালানো হয় তখন শক্তির কী কী রূপান্তর ঘটে?

২) ঠান্ডা পানির গ্লাস হাত দিয়ে ধরে রাখলে হাত ঠান্ডা হয়ে যায়। তোমার বন্ধু মনে করে গ্লাসের ঠান্ডা হাতে চলে যাওয়ার কারণে হাত ঠান্ডা হয়ে যায়। তার ধারণাটি কী সঠিক? ব্যাখ্যা কর।

৩) যখন হাঁড়িতে ভাত রান্না করা হয় তখন তাপ কীভাবে সঞ্চালিত হয় ?

৪) বাড়ির আশপাশে বৃক্ষ রোপণ করে কীভাবে শক্তির সাশ্রয় করা যায় ?

সুস্থ জীবনের জন্য খাদ্য

আমরা চতুর্থ শ্রেণিতে জেনেছি, সুষম খাদ্য আমাদের সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। তবে মানুষের বয়স ও কাজ অনুযায়ী খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদার পরিমাণে কম-বেশি হয়ে থাকে। তাই জানা দরকার আমাদের শরীরের জন্য কতটুকু পুষ্টি প্রয়োজন? তাছাড়া সুস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের কোন কোন খাবার খাওয়া উচিত ?

১. সুষম খাদ্য

(১) সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ ওজনজনিত সমস্যা সৃষ্টি করে

সুষম খাদ্য গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ ও সবল থাকার জন্য আমাদের সঠিক পরিমাণ পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ না করলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সহজেই রোগে আক্রান্ত হয়। শরীরের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। আবার অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে ওজনজনিত সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের বয়স ও কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। তবে যারা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে, তাদের বেশি খাদ্যের প্রয়োজন।

(২) প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ

প্রশ্ন : কীভাবে আমরা সুষম খাদ্য নির্বাচন করতে পারি?

কাজ : খাদ্যের পরিমাণ

কী করতে হবে :

১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

কখন খেয়েছি ?	কী খেয়েছি ?	কতটুকু খেয়েছি ?
সকাল	পরটা ও কলা	২টি ও ১টি

২. গতকাল কী খেয়েছি, কখন খেয়েছি এবং কতটুকু খেয়েছি তার একটি তালিকা তৈরি করি।
৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

(৩) নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব:

কোন প্রকার রাসায়নিক দূষণ বা ক্ষতিকর জীবাণুমুক্ত খাবারকে নিরাপদ খাবার বলা হয়। খাবার পুষ্টিকর হলেও নিরাপদ হওয়া দরকার। পুষ্টিকর খাদ্য নিরাপদ না হলে আমাদের শরীরে কোনো কাজে আসে না। প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ না করলে শরীর যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনি অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণে নানা প্রকার রোগব্যাধি হয়।

সারসংক্ষেপ

সুষম খাদ্য গ্রহণ বলতে খাদ্যের প্রতিটি প্রকার থেকে সঠিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করাকে বোঝায়। নিচের ছকে ৬–১২ বছর বয়সের শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের পরিমাণের একটি সাধারণ নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৬ –১২ বছর বয়সের শিশুর খাদ্য তালিকা

খাদ্যের প্রকারভেদ	খাদ্যের নমুনা	পরিমাণ	কত বার
খাদ্যশস্য ও আলু (শর্করা)	রুটি, পরটা, পাউরুটি	১–২টা	প্রতিদিন ৩ – ৪ বার
	ভাত, আলু , অথবা নুডুলস	১ কাপ	
শাক-সবজি (ভিটামিন, খনিজ লবণ)	রান্না করা বা কাঁচা সবজি	আধা কাপ	প্রতিদিন ৩ অথবা ৪ বার
ফলমূল (ভিটামিন, খনিজ লবণ)	যে কোনো ধরনের ফল। যেমন– আম, আপেল, কমলা	১টি	প্রতিদিন ২ অথবা ৩ বার
	ফলের রস	ছোট গ্লাসের ১ গ্লাস	
মাছ, মাংস ও ডাল (আমিষ)	মাংস	১-৩ টুকরা	প্রতিদিন ১ –২ বার
	মাছ	মাঝারি মাপের ১ টুকরো	
	ডিম	১টি	
	ডাল	মাঝারি মাপের ১-৩ কাপ	
দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য (ক্যালসিয়াম, ভিটামিন)	দুধ	এক গ্লাস	প্রতিদিন ১ –২ বার
	দই	এক কাপ	
	পনির	এক টুকরা	
তেল ও চর্বি	ঘি, মাখন অথবা তেল	১ টেবিল চামচ	১ বার
আঁশজাতীয় খাদ্য	বিভিন্ন প্রকারের শাক সবজি, ফলমূল, ঢেঁকি ছাটা চাল ইত্যাদি।	১৫-২০ গ্রাম	প্রতিদিন ১-২ বার

আলোচনা

◆ **আমরা যা খাই তা কি সুষম খাবার?**

১. ডানে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

২. গতকাল যে সকল খাবার খেয়েছি সেগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করি এবং মোট কতবার খেয়েছি তার তালিকা করি।

৩. খাবারের তালিকাটি পূর্বের ছকের সাথে তুলনা করি এবং তা সুষম কি না যাচাই করি।

৪. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

খাদ্যের প্রকারভেদ	যা খেয়েছি	কত বার খেয়েছি
খাদ্যশস্য ও আলু		
শাকসবজি		
ফল-মূল		
মাছ, মাংস ও ডাল		
দুগ্ধজাতীয় খাদ্য		
তেল ও চর্বি		
আঁশজাতীয় খাদ্য		

২. খাদ্য সংরক্ষণ

বছরের সব সময় সব ধরনের খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। তাই মৌসুম ব্যতীত বছরের অন্য সময়ে পাওয়ার জন্য নানাভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হয়।

প্রশ্ন : কীভাবে আমরা খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারি ?

কাজ : **খাদ্য সংরক্ষণের উপায়**

কী করতে হবে :

১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

খাদ্য	কীভাবে সংরক্ষণ করা হয় ?
মাংস (গরু, মুরগি), মাছ	
দুগ্ধজাত খাদ্য (দুধ, মাখন, দই)	
শাকসবজি	
ফলমূল	

২. কীভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় তার একটি তালিকা তৈরি করি।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

খাদ্য সংরক্ষণের উপায়

বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিভিন্নভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়। চাল, ডাল, গম ইত্যাদি রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। মাছ, মাংস, সবজি, ফল ইত্যাদি ফ্রিজের ঠান্ডায় বেশ কিছু দিন ভালো থাকে। শাকসবজি, ফলমূল, ফ্রিজে রাখার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ ছাড়াও হিমাগারে শাকসবজি, মাছ, মাংস ইত্যাদি সংরক্ষণ করে বছরের বিভিন্ন সময় বাজারে সরবরাহ করা হয়। ফলমূল প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি জ্যাম, জেলি, আচার ইত্যাদি হিসেবে বায়ুরোধী পাত্রে অনেক-দিন সংরক্ষণ করা যায়। এ ছাড়া লবণ দিয়ে বা বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা যায়। আবার চিনি, সিরকা বা তেল দিয়ে জলপাই, বরই, আম ইত্যাদি খাদ্য অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়।

খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

খাদ্য সংরক্ষণ অপচয় রোধ করে ও দ্রুত পচন থেকে খাদ্যকে রক্ষা করে। মাছ, মাংস, সবজি, ফল, দুগ্ধজাত খাদ্য ইত্যাদি খুব সহজেই জীবাণু দ্বারা পচে নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্য সংরক্ষণ খাবারে পচন সৃষ্টিকারী জীবাণু জন্মাতে বাধা দেয়। খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে

খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায়

বিভিন্ন মৌসুমি খাদ্যদ্রব্য সারা বছর পাওয়া যায়। এ ছাড়া খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে অনেক দূরবর্তী এলাকায় সহজে খাবার সরবরাহ করা যায়।

৩. যে সকল খাদ্য কম খাওয়া উচিত

প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে আমাদের সুষম খাদ্য খেতে হবে। কিন্তু সুস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের কোন কোন খাবার খাওয়া উচিত ?

প্রশ্ন : কোন কোন খাবার পরিহার করা উচিত ?

কাজ : **খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ**
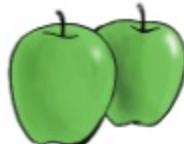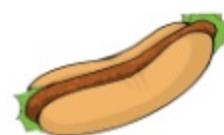
কী করতে হবে :

১. নিচের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

স্বাস্থ্যসম্মত	স্বাস্থ্যসম্মত নয়

২. নিচের ছবিটি লক্ষ করি। খাবারগুলোকে “স্বাস্থ্যসম্মত” এবং “স্বাস্থ্যসম্মত নয়” এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করে ছকে লিখি।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

কোন কোন খাবার নিয়মিত খাওয়া উচিত এবং কোনগুলো কম খাওয়া উচিত তা জানা জরুরি। কিছু খাদ্য রয়েছে যেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। আবার কিছু খাদ্য রয়েছে যা শরীরে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে।

কৃত্রিম রং ও রাসায়নিক পদার্থ মেশানো খাদ্য

খাবারকে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করতে কোনো কোনো খাবারে **কৃত্রিম রং** মেশানো হয়। যেমন– মিষ্টি, জেলি, চকলেট, আইসক্রিম, কেক, চিপস, কোমল পানীয় ইত্যাদিতে কৃত্রিম রং রয়েছে। কোনো কোনো কৃত্রিম রং মেশানো খাবার মানুষের ক্যান্সার, অমনোযোগিতা, অস্থিরতা ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করতে পারে। অসাধু ব্যবসায়ীরা খাবারে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে থাকে। খাবার সংরক্ষণ ও ফল পাকানোর জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এ সকল ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণের ফলে বৃক্ক ও যকৃৎ অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। ক্যান্সারের মতো রোগ হতে পারে।

কৃত্রিম রং মেশানো খাদ্য

জাঙ্ক ফুড

তোমাদের কেউ কেউ হয়তো "জাঙ্ক ফুড"- এর নাম শুনে থাকবে। জনপ্রিয় জাঙ্ক ফুডের মধ্যে রয়েছে বার্গার, পিজা, পটেটো চিপস, ফ্রাইড চিকেন, কোমল পানীয় ইত্যাদি। জাঙ্ক ফুড সুস্বাদু হলেও সুষম খাদ্য নয়। জাঙ্ক ফুডে অত্যধিক চিনি, লবণ ও চর্বি থাকে। এসব উপাদান আমাদের শরীরে পরিমিত পরিমাণে প্রয়োজন। কিন্তু জাঙ্ক ফুডে এসব উপাদান মাত্রাতিরিক্ত থাকায় শরীরের জন্য ক্ষতিকর। সাধারণ খাবারের বদলে জাঙ্ক ফুড খেলে পুষ্টিহীনতা, অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি বা মোটা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে।

অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড খাওয়ার ফলে মুটিয়ে যাওয়া

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) কোনটি জাঙ্ক ফুড?

ক. পাউরুটি   খ. দই

গ. পরটা   ঘ. পটেটো চিপস

২) জাঙ্ক ফুড খাওয়ার ফলে কোনটি হতে পারে?

ক. যকৃৎ অকার্যকর হওয়া   খ. মোটা হয়ে যাওয়া

গ. শ্বাসকষ্ট   ঘ. ক্যান্সার

৩) মাছ ও মাংসে কোনটির মাধ্যমে পচন ধরতে পারে ?

ক. চিনি   খ. কৃত্রিম রং

গ. জীবাণু   ঘ. লবণ

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) খাদ্য সংরক্ষণের ৩টি উপায় বর্ণনা করি।

২) খাদ্য সংরক্ষণের উপকারিতা কী ?

৩) সুষম খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন কেন ?

৪) কীভাবে আমরা সুষম খাদ্য পেতে পারি ?

৫) কোন কোন খাদ্যে কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হয় ?

৬) নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ না করলে কী কী হতে পারে?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) একটি বার্গারে বিভিন্ন ধরনের খাবার যেমন– গরু ও মুরগির মাংস, টমেটো, লেটুস, পনির, পাউরুটি ইত্যাদি থাকে। তারপরেও খুব বেশি বার্গার খাওয়া আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর কেন ?

২) খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা কীভাবে উপকৃত হই?

৩) খাদ্যে রাসায়নিকের ব্যবহার আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কেন ব্যাখ্যা করি।

অধ্যায় ৭

স্বাস্থ্যবিধি

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে আমরা স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারি এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরেও আমরা রোগাক্রান্ত হই। আমরা কেন রোগাক্রান্ত হই? আমরা কীভাবে রোগ প্রতিরোধ এবং রোগের প্রতিকার করতে পারি?

১. সংক্রামক রোগ

(১) সংক্রামক রোগ কী?

বিভিন্ন জীবাণু যেমন– ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ইত্যাদির মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কিছু রোগ আছে যা একজন থেকে আরেকজনের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরকে সংক্রামক রোগ বলে।

(২) সংক্রামক রোগের বিস্তার

সংক্রামক রোগ বিভিন্নভাবে ছড়াতে পারে। কিছু কিছু রোগ হাঁচি-কাশির মাধ্যমে একজন থেকে আরেক জনে সংক্রমিত হয়। সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস যেমন– গ্লাস, প্লেট, চেয়ার, টেবিল, জামাকাপড়, টয়লেট ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে ও আমরা জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারি। মশার মতো পোকামাকড় বা কুকুরের মতো প্রাণীর কামড়ের মাধ্যমে কিছু রোগ ছড়াতে পারে। আবার দূষিত খাদ্য গ্রহণ এবং দূষিত পানি পানের মাধ্যমেও সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে।

হাঁচির মাধ্যমে জীবাণু ছড়ায়

মশা বিভিন্ন রোগ জীবাণু বহন করে

আলোচনা

◆ সংক্রামক রোগ কীভাবে ছড়ায় ?

১. ডানপাশে দেওয়া ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

২. কী কী উপায়ে সংক্রামক রোগ ছড়ায় তার একটি তালিকা তৈরি করি।

৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

সংক্রামক রোগ কীভাবে ছড়ায় ?

(৩) সংক্রামক রোগের প্রকারভেদ

সংক্রামক রোগ অনেক ধরনের হয়ে থাকে যা নিচে দেওয়া হলো।

গুটিবসন্ত

বায়ুবাহিত রোগ

বায়ুবাহিত রোগ হলো সে সকল রোগ যা হাঁচি-কাশি বা কথাবার্তা বলার সময় বায়ুতে জীবাণু ছড়ানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। সোয়াইন ফ্লু, হাম, গুটিবসন্ত, যক্ষ্মা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি বায়ুবাহিত রোগ।

পানিবাহিত রোগ

পানিবাহিত রোগ হলো সে সকল রোগ যা জীবাণুযুক্ত দূষিত পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। অনেক ধরনের পানিবাহিত রোগ রয়েছে। যেমন– ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয় ও টাইফয়েড।

ছোঁয়াচে রোগ

রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে যে সকল রোগ সংক্রমণ হয় তাই ছোঁয়াচে রোগ। যেমন–ফ্লু, ইবোলা, হাম ইত্যাদি। **এইডস** একটি ভিন্ন ধরনের রোগ,যা **এইচআইভি** ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায়। যদিও আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে বা তার ব্যবহৃত কোনো জিনিস ব্যবহার করলে কেউ এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হবে না।

জলাতঙ্ক আক্রান্ত কুকুর

প্রাণী ও পোকামাকড়বাহিত সংক্রামক রোগ

বিভিন্ন প্রাণী এবং পোকামাকড়ের মাধ্যমে কিছু জীবাণুবাহিত রোগ ছড়ায়। যেমন– কুকুরের কামড়ের মাধ্যমে জলাতঙ্ক রোগ ছড়ায়। মশার কামড়ের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু রোগ ছড়ায়।

আলোচনা

◆ **সংক্রামক রোগ এর শ্রেণিবিন্যাস**

১. ডান পাশে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

রোগের প্রকারভেদ	রোগের নাম
বায়ুবাহিত	
পানিবাহিত	
ছোঁয়াচে	
প্রাণী এবং পোকামাকড় বাহিত	

২. ছকে সংক্রামক রোগের একটি তালিকা তৈরি করি।

৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

(৪) সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ এবং প্রতিকার

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের উপায়

সংক্রামক রোগ জীবাণুর মাধ্যমে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা, নিরাপদ পানি ব্যবহার করা এবং হাত জীবাণুমুক্ত রাখার মাধ্যমে আমরা সুস্থ থাকতে পারি। এ ছাড়া ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। হাঁচি-কাশির সময় টিস্যু, রুমাল বা হাত দিয়ে মুখ ঢাকা, চারপাশের পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে পারি। বাড়ির আশপাশে পানি জমতে পারে এমন আবর্জনা যেমন– কৌটা, টায়ার, ফুলের টব ইত্যাদি পরিস্কার রাখতে হবে। কারণ, এখানে জমে থাকা পানিতে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া রোগের বাহক মশা ডিম পাড়ে। প্রয়োজনীয় টিকা নিয়ে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিহার করেও আমরা রোগমুক্ত থাকতে পারি।

হাঁচি–কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখা

পোলিও টিকা গ্রহণ করা

সংক্রামক রোগের প্রতিকার

রোগাক্রান্ত হলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে, পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করতে হবে। এগুলো আমাদের সেরে উঠতে সাহায্য করে। হালকা জ্বর হলে বা সামান্য মাথাব্যথা করলে প্রাথমিকভাবে কিছু ঔষধ গ্রহণ করলে আমরা ভালো বোধ করি। তবে যদি জ্বর ভালো না হয়, ক্রমাগত বমি হতে থাকে এবং তীব্র মাথাব্যথা হয় তবে আমাদের অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে।

আলোচনা

◆ রোগ প্রতিরোধে আমরা কী করতে পারি ?

১. ডান পাশের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

২. রোগ প্রতিরোধে আমাদের কী করণীয় আছে তার তালিকা তৈরি করি।

৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

আমাদের কী করণীয় ?

২. বয়ঃসন্ধি

(১) বয়ঃসন্ধি কী?

বয়ঃসন্ধি হলো জীবনের এমন এক পর্যায় যখন আমাদের শরীর শিশু অবস্থা থেকে কিশোর অবস্থায় পৌছায়। সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি ৮ থেকে ১৩ বছরে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ৯ থেকে ১৫ বছর বয়সে শুরু হয়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন হয়ে থাকে।

(২) বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনের প্রভাবে শরীরে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন– দ্রুত লম্বা হওয়া, শরীরের গঠন পরিবর্তিত হওয়া, একটু বেশি ঘাম হওয়া, ত্বক তৈলাক্ত হওয়া, ব্রণ উঠা ইত্যাদি। এ সময় শরীরের ওজনও বৃদ্ধি পায়। ছেলেদের গলার স্বরের পরিবর্তন হয়, মাংসপেশি সুগঠিত হয় এবং দাড়ি-গোঁফ গজাতে শুরু করে। এ সময় মেয়েদেরও মাংসপেশি সুগঠিত হতে শুরু করে তবে তা ছেলেদের চেয়ে কম।

(৩) বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের যত্ন

বয়ঃসন্ধিকালে কোনো কিছু নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে কিংবা আবেগের দিক থেকে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। এ সময় অনেকেই খুব আবেগপ্রবণ হয় বা অল্পতেই হতাশ হয়ে পড়ে। আবার শারীরিক পরিবর্তন দেখে অনেকে দুশ্চিন্তায় ভোগে। এই সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা খুবই জরুরি। মনে রাখা প্রয়োজন, বয়ঃসন্ধিকাল সবার জীবনেই আসে। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। তাই কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে মা-বাবা, শিক্ষক কিংবা বড় ভাই বা বোনের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

- **তোমার সমস্যাগুলো কী কী?**
  1. ছেলে ও মেয়ের আলাদা দুটি দল গঠন করি।
  2. দলের সদস্যদের নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা এবং এ থেকে সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করি।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) টাইফয়েড এর জীবাণু নিচের কোনটির মাধ্যমে ছড়াতে পারে ?

ক. পানি　　খ. বায়ু

গ. মাটি　　ঘ. পোকামাকড়

২) কোনটি ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গু রোগের বাহক ?

ক. কুকুর　　খ. প্রজাপতি

গ. মশা　　ঘ. মাছি

৩) বয়ঃসন্ধিকালে নিচের কোনটি হয়ে থাকে ?

ক. সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক　　খ. পড়াশোনার প্রতি অধিক মনোযোগ

গ. শরীরের গঠন পরিবর্তন　　ঘ. বেশি বেশি অসুস্থ হওয়া

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) কীভাবে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায় তার ৫টি উপায় লেখ।

২) বায়ুবাহিত রোগ কী ?

৩) সংক্রামক রোগ প্রতিকারের উপায়গুলো কী ?

৪) সংক্রামক রোগ এর কারণ কী?

৫) বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের পরিবর্তনের কারণে দুশ্চিন্তা হলে তুমি কী করবে ?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) সংক্রামক রোগ কীভাবে ছড়ায় তা ব্যাখ্যা কর।

২) পানি জমে থাকে এমন বস্তু যেমন– গামলা, টায়ার ইত্যাদি সরিয়ে ফেলার মাধ্যমে আমরা ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে পারি। এর কারণ কী ?

৩) পানিবাহিত এবং বায়ুবাহিত রোগের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য কোথায় ?

৪) হাঁচি-কাশির সময় হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বা রুমাল ব্যবহার করে আমরা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে পারি। এক্ষেত্রে হাতের তালু ব্যবহার করার চেয়ে হাতের উল্টো পিঠ বা কনুই এর ভাঁজ ব্যবহার করা ভালো কেন?

অধ্যায় ৮

মহাবিশ্ব

রাতের আকাশে খালি চোখে তুমি অসংখ্য তারা বা নক্ষত্র দেখতে পাও। **দূরবীক্ষণ যন্ত্রের** সাহায্যে তুমি সেই নক্ষত্রসমূহকে আরও স্পষ্ট এবং বড় দেখতে পাও। মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সি নিয়ে গবেষণা করতে বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন।

দূরবীক্ষণ

১. মহাবিশ্ব এবং পৃথিবী

(১) মহাবিশ্বের আকার

প্রশ্ন : মহাবিশ্ব কত বড় ?

কাজ : **আলো কত দ্রুত চলতে পারে**

কী করতে হবে :

১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

	পৃথিবী থেকে দূরত্ব	পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে?
চাঁদ	৩,৮৪,৪০০কি.মি.	
সূর্য	১৫,০০,০০,০০০কি.মি.	

২. আলো এক সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কি.মি. বেগে চলে। চাঁদ এবং সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে তা হিসাব করি।

৩. উত্তরগুলো ছকে লিখি।

৪. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।
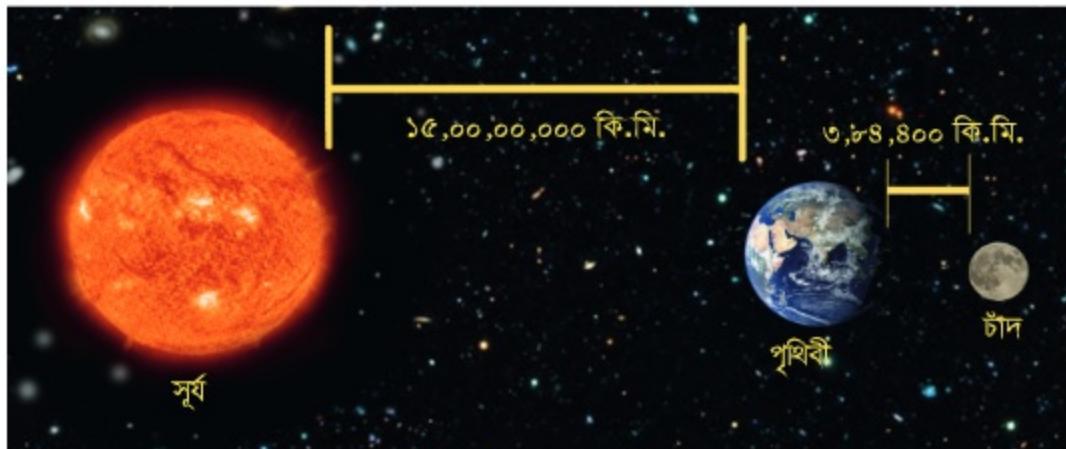
চাঁদ ও সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে কত সময় লাগে তা আমরা কীভাবে হিসাব করতে পারি?

আমরা দূরত্বকে আলোর বেগ দিয়ে ভাগ করে সময় বের করতে পারি

সারসংক্ষেপ
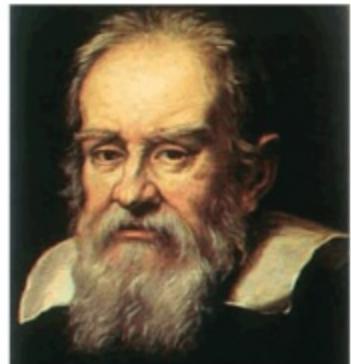
পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কি.মি.। আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কি.মি. বেগে চলে। আর তাই, চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে ১.৩ সেকেন্ড সময় লাগে। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ১৫,০০,০০,০০০ কি.মি.। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগে। তার মানে হলো আমরা সবসময়ই ৮ মিনিট পূর্বে সূর্য থেকে উৎসারিত আলো দেখতে পাই।

পৃথিবী থেকে সূর্য এবং চাঁদের দূরত্ব

যদি আমরা আলোর গতিতে চলতে পারতাম তবে আকাশগঙ্গা ছায়াপথের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে আমাদের ১,৩০,০০০ বছর সময় লাগত। মহাকাশের ছায়াপথসমূহের মধ্যে আকাশগঙ্গা একটি ছায়াপথ। স্যার এডিংটনের মতে, প্রতি ছায়াপথে গড়ে দশ সহস্রকোটি নক্ষত্র রয়েছে।

গ্যালিলিও গ্যালিলি

মহাবিশ্ব এখনও প্রসারিত হচ্ছে। আর এই কারণে মহাবিশ্বের প্রকৃত আকার সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন না। তবে মহাকাশ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা থেকে আমরা ধারণা করতে পারি, মহাবিশ্ব কত বড়। মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণাকে বলা হয় **জ্যোতির্বিজ্ঞান**। বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি যেমন–দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করছেন। গ্যালিলিও গ্যালিলি উন্নত দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন যে, সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন এবং মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করছেন।
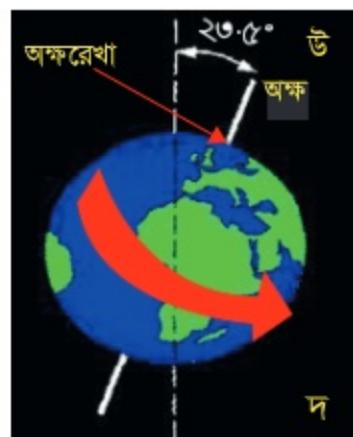
(২) পৃথিবীর গতি
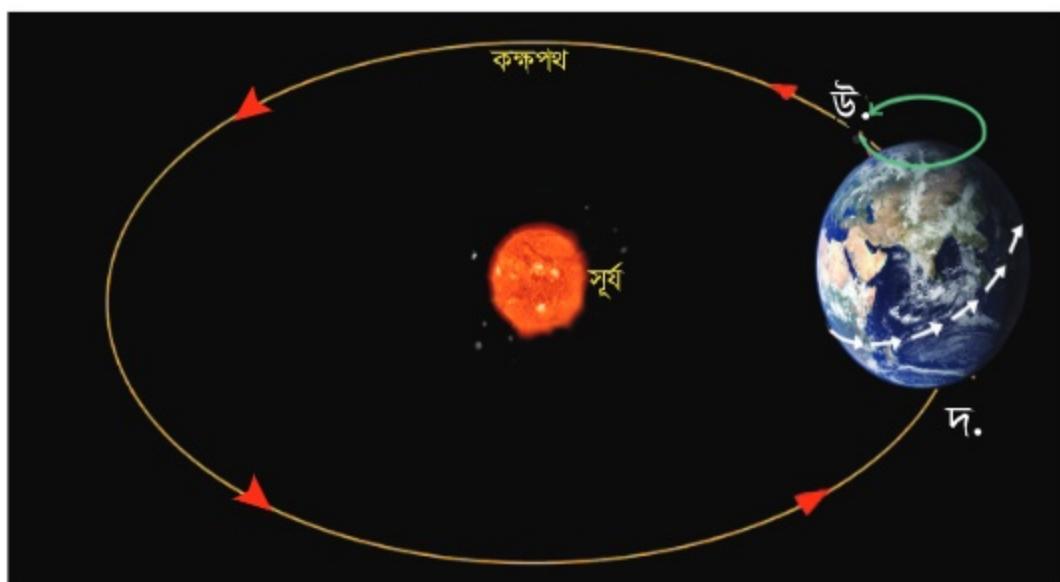
প্রশ্ন : পৃথিবী কীভাবে ঘোরে?

পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। অন্যান্য গ্রহের মতো পৃথিবীও সূর্যের চারপাশে একটি নির্দিষ্ট পথে ঘোরে। যে পথে পৃথিবী বা অন্য কোনো গ্রহ সূর্যকে আবর্তন করে তাকে সেই গ্রহের কক্ষপথ বলে। সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর আবর্তনকে বার্ষিক গতি বলে। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময় লাগে।

সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনের সাথে সাথে পৃথিবী লাটিমের মতো নিজ অক্ষের উপরে ঘুরছে। নিজ অক্ষের উপর পৃথিবীর এই ঘূর্ণায়মান গতিকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলে। অক্ষ হলো কোন বস্তুর কেন্দ্র বরাবর ছেদকারী কাল্পনিক রেখা। পৃথিবীর অক্ষরেখাটি একে উত্তর-দক্ষিণ মেরু বরাবর ছেদ করেছে। পৃথিবীর অক্ষরেখাটি পৃথিবীর কক্ষপথের তলের সাথে কিছুটা হেলে রয়েছে।

পৃথিবীর আবর্তন এবং এর অক্ষরেখা

নিজ অক্ষে আবর্তন এবং সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষপথ

২. দিন এবং রাত

প্রশ্ন : দিন এবং রাত কীভাবে হয়?
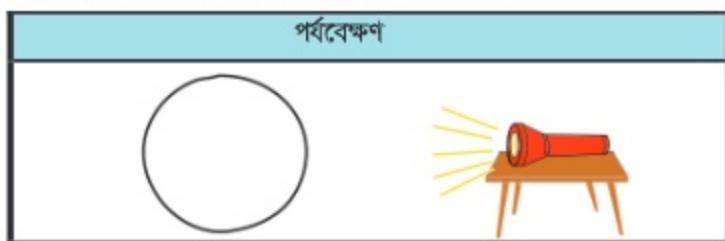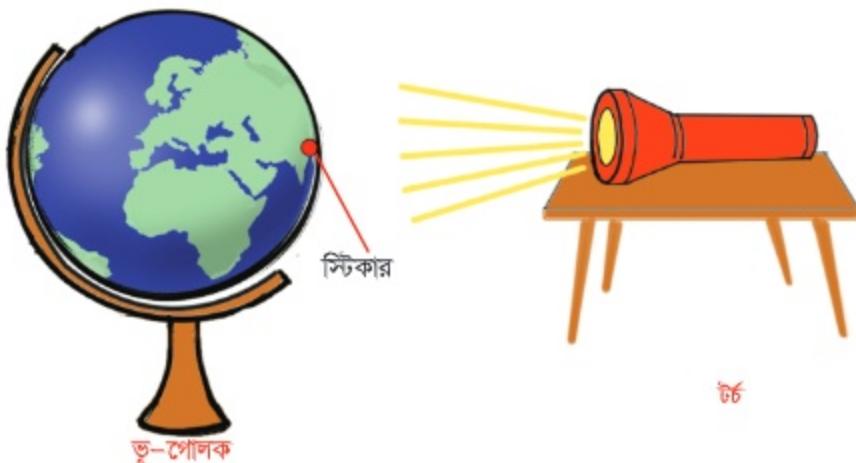
কাজ : দিন এবং রাত হওয়ার কারণ

কী করতে হবে :

১. পৃথিবীর নমুনা স্বরূপ একটি ভূগোলক বা বল, একটি স্টিকার এবং সূর্যের নমুনা স্বরূপ একটি উজ্জ্বল টর্চ নেই।

২. নিচের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

৩. ভূগোলকে বাংলাদেশের উপর স্টিকার লাগাই।

৪. শ্রেণিকক্ষটি অন্ধকার করে ভূগোলকের উপর টর্চ এর আলো নিক্ষেপ করি।

৫. ভূগোলকটি পর্যবেক্ষণ করে ছকে তার ছবি আঁকি।

৬. ভূগোলকটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ধীরে ধীরে ঘুরাই এবং স্টিকারটির অবস্থান পর্যবেক্ষণ করি।

৭. ভূগোলকটির কোন পাশে দিন বা রাত তা নিয়ে চিন্তা করি।

৮. নিজের ধারণাটি খাতায় লিখি।

৯. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

২০২৫

পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে **দিন** এবং **রাত** হয়।

দিন এবং রাত

পৃথিবী নিজ অক্ষের চারপাশে ক্রমাগত ঘুরছে। আর এ কারণে প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠে এবং সন্ধ্যায় অস্ত যায়। পৃথিবীর এক অংশ সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এবং অপর অংশ সূর্যের বিপরীতে থাকে। যে অংশটা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে সেই অংশটায় দিন এবং যে অংশটা বিপরীত দিকে থাকে সেই অংশটায় রাত হয়।

উত্তর মেরুর দিক থেকে তাকালে পৃথিবীর এই ঘূর্ণনকে ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনের বিপরীত দিকে বলে দেখা যায়। নিজ অক্ষের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে অর্থাৎ৩৬০° ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪.০৯০৫ সেকেন্ড। কিন্তু ততক্ষণে পৃথিবী তার কক্ষপথে কিছুটা এগিয়ে যায় এবং সেটাও ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনের বিপরীত দিকেই হয়। সুতরাং সূর্যের সাপেক্ষে ঠিক একই অবস্থায় আসতে পৃথিবীর আরো কিছু বেশি সময় লাগে। এই পুরো সময়টাকে বলে এক সৌর দিন, যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা।

দিন এবং রাত

সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত

প্রতিদিনের সূর্যকে দেখে মনে হয় যে, এটি সকালে পূর্ব দিকে ওঠে এবং দিনের শেষে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে নিজ অক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণেই এমনটি হয়। পৃথিবীর এই ঘূর্ণনের কারণে সূর্য পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে তার অবস্থান পরিবর্তন করছে বলে মনে হয়।

দেখে মনে হয় সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে আসছে

২০২৫

৩. ঋতু

বছরে আমরা ছয়টি ঋতু দেখতে পাই। যেমন– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত।

প্রশ্ন : ঋতু পরিবর্তন কেন হয় ?

কাজ : দিন এবং রাতের দৈর্ঘ্য

কী করতে হবে:

১. পৃথিবীর নমুনা স্বরূপ একটি ভূগোলক, দাগ মুছে ফেলা যায় এমন মার্কার, পরিমাপক ফিতা এবং সূর্যের নমুনা স্বরূপ একটি উজ্জ্বল টর্চ নিই।
২. নিচের ছকটির মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

	ক টর্চের অভিমুখে উত্তর মেরু	খ টর্চের বিপরীতে উত্তর মেরু
দিনের দৈর্ঘ্য (সে.মি.)		
রাতের দৈর্ঘ্য (সে.মি.)		

৩. মার্কার দিয়ে ভূগোলকের উপর বাংলাদেশ বরাবর গোল করে একটি দাগ দিই (ছবিতে লাল দাগ)।
৪. একটি টেবিলের উপরে টর্চটি রাখি।
৫. ভূগোলকটি ছবি ক–এর মতো করে রাখি।
৬. ফিতা ব্যবহার করে দাগ বরাবর দিন এবং রাতের গোলীয় অংশের দৈর্ঘ্য মাপি এবং পরিমাণটি ছকে লিখি।
৭. ভূগোলকটি ছবি খ–এর মতো করে রাখি।
৮. ফিতা ব্যবহার করে দাগ বরাবর দিন এবং রাতের গোলীয় অংশের দৈর্ঘ্য মাপি এবং তা ছকে লিখি।
৯. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

ছবি ক

ছবি খ

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর নিজস্ব কক্ষপথে ঘূর্ণন এবং সূর্যের দিকে এর হেলে থাকা অক্ষের কারণে ঋতু পরিবর্তন হয়। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আবর্তনের জন্য বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ সূর্যের দিকে বা সূর্যের বিপরীত দিকে সরে পড়ে।

গ্রীষ্মকাল

যখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকে সে অংশে তখন গ্রীষ্মকাল।এ সময় উত্তর গোলার্ধে সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয়। দিনের সময়কাল দীর্ঘ হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এসময় দক্ষিণ গোলার্ধে উলটা ব্যাপারটি ঘটে। সেখানে তখন শীতকাল।

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল

শীতকাল
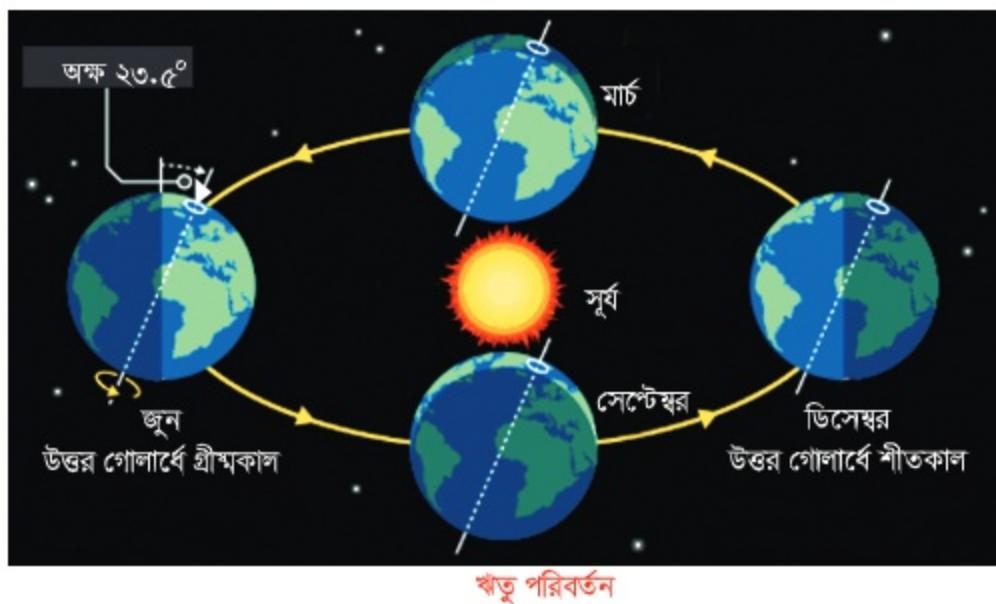
যখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের বিপরীত দিকে হেলে থাকে সে অংশে তখন শীতকাল। এ সময় উত্তর গোলার্ধে সূর্য তীর্যকভাবে কিরণ দেয়। দিনের চেয়ে রাত বড় হয় এবং তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

উত্তর গোলার্ধে শীতকাল

শরৎকাল ও বসন্তকাল:

শীত আর গ্রীষ্মের ঠিক মাঝামাঝি সময় দুটোতে সব গোলার্ধেই দিন ও রাত প্রায় সমান দীর্ঘ হয়। তখন শরৎকাল বা বসন্তকাল হয়।

ঋতু পরিবর্তন

৪. চাঁদের দশাসমূহ বা অবস্থার পরিবর্তন

চাঁদ কখনো বড় আবার কখনো ছোট এবং কখনো গোলাকার বা অর্ধ-গোলাকার মনে হয়। চাঁদের উজ্জ্বল অংশের আকৃতির এরূপ পরিবর্তনশীল অবস্থাকে চাঁদের দশা বলে।

প্রশ্ন : চাঁদের দশা কেন পরিবর্তিত হয় ?

কাজ : একটি বলের বিভিন্ন দশা

কী করতে হবে :

১. সূর্যের নমুনা স্বরূপ একটি উজ্জ্বল বাতি বা টর্চ, চাঁদের নমুনা স্বরূপ একটি সাদা বল (যেমন–টেনিস বল, ক্রিকেট বল) নিই।
২. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

ক অবস্থান	খ অবস্থান	গ অবস্থান	ঘ অবস্থান

৩. মোমবাতি বা টর্চটি জ্বালিয়ে শ্রেণিকক্ষের আলো নিভিয়ে দিই।
৪. বলটি ‘ক’,‘খ’,‘গ’ ও ‘ঘ’ অবস্থানে রাখি।
৫. ‘ঙ’ অবস্থান থেকে প্রতিটি অবস্থানের জন্য বলটির পৃষ্ঠদেশ পর্যবেক্ষণ করি। (দ্রষ্টব্য: ‘গ’ অবস্থানে বলটি পর্যবেক্ষণের সময় লক্ষ রাখতে হবে যাতে বলের উপর নিজের ছায়া না পড়ে।)
৬. একইভাবে বাকি অবস্থানের বলগুলো পর্যবেক্ষণ করি এবং তার ছবি আঁকি।
৭. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।
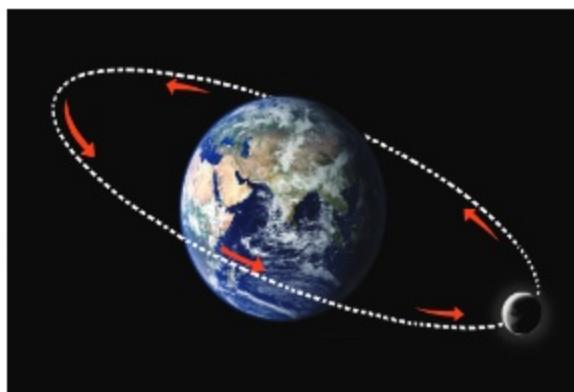
সারসংক্ষেপ

চাঁদের আবর্তন

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। **উপগ্রহ** হলো সেই বস্তুপিণ্ড যা কোন গ্রহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। চাঁদ তার নিজের অক্ষ বরাবর প্রায় ২৮ দিনে একবার ঘোরে এবং একই সাথে পৃথিবীর চারদিকেও একবার ঘুরে আসতে চাঁদের প্রায় ২৮ দিন সময় লাগে।

চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে

চাঁদের ঘূর্ণন

চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। চাঁদ সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে। চাঁদের অর্ধাংশ সূর্যের আলোতে সবসময়ই আলোকিত। কিন্তু পৃথিবীকে আবর্তনের সময় পৃথিবীর দিকে মুখ করা চাঁদের আলোকিত অংশের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। এর ফলে চাঁদের বিভিন্ন দশার সৃষ্টি হয়। আমরা শুধুমাত্র চাঁদের আলোকিত অংশই দেখতে পাই। যখন আমরা চাঁদের আলোকিত অংশ সম্পূর্ণ গোলাকার দেখতে পাই তখন আমরা একে পূর্ণিমার চাঁদ বলি। আর যখন আমরা চাঁদের আলোকিত অংশ একেবারেই দেখতে পাই না তখন একে অমাবস্যার চাঁদ বলি।

চাঁদের অবস্থান এবং দশাসমূহ

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) কোনটি সঠিক ?

ক. চাঁদের নিজস্ব আলো রয়েছে খ. চাঁদ একটি উপগ্রহ
গ. চাঁদ একটি গ্রহ ঘ. চাঁদ সূর্যের চারপাশে ঘোরে

২) সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর কত সময় লাগে?

ক. ২৪ দিন খ. ২৮ দিন
গ. ৩৬৫ দিন ঘ. ৭ দিন

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) পৃথিবীর দুই ধরনের গতি কী কী ?
২) দিন এবং রাত কী কারণে হয়?
৩) চাঁদের বিভিন্ন দশার কারণ কী ?
৪) গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য কী?
৫) গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় কেন?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) ঋতু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করি।
২) সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিম আকাশে চলমান মনে হয় কেন ? ব্যাখ্যা করি।
৩) পৃথিবীর অর্ধেক উত্তরাংশ সূর্যের দিকে হেলে পড়লে কী ঘটে? তখন দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের কী পরিবর্তন ঘটে?
৪) কীভাবে সৌরজগৎ, আকাশগঙ্গা ছায়াপথ ও মহাবিশ্ব সম্পর্কযুক্ত ?
৫) নিচের ছবি দুইটি দেখ। দুইটি ছবিই দিনের একই সময়ে একই স্থানে তোলা হলেও দেখতে ভিন্ন। এর কারণ কী ?

বিকাল ৫:০০, জুন

বিকাল ৫:০০, ডিসেম্বর

অধ্যায় ৯

আমাদের জীবনে প্রযুক্তি

বর্তমানে আমরা প্রযুক্তির বিভিন্ন ফসল যেমন- বই, কলম, টেবিল, বৈদ্যুতিক বাতি, ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে লেখাপড়া করছি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য কী? এদের মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে ?

১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

প্রশ্ন : প্রযুক্তির উদ্ভাবনে আমরা কীভাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করি?

কাজ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার

কী করতে হবে :

১. নিচের ছকের মতো করে একটি ছক তৈরি করি।

ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ	প্রযুক্তি	বৈজ্ঞানিক জ্ঞান
পরিবহন	যেমন– গাড়ি	যেমন– তাপ শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি
চিকিৎসা		
কৃষি		
বাসাবাড়ি		

২. ছকে উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কোন প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহৃত হয় তার তালিকা তৈরি করি।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

টেলিভিশন প্রযুক্তির একটি ফসল। এতে কী ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহৃত হয় ?

আমার মনে হয় টেলিভিশনে আমরা বিদ্যুৎ, শক্তির রূপান্তর, আলো, শব্দ এবং তাপ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করি।

সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পার্থক্য

বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করে। প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি** অনুসরণ করেন। যার মধ্যে নিম্নোক্ত ধাপসমূহ রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ধাপসমূহ	বিবরণ
পর্যবেক্ষণ	আমাদের চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়ে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনা কিংবা নিজের পছন্দের কোনো বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করি।
প্রশ্নকরণ	যখন আমরা কোনো কিছু দেখি, শুনি বা পড়ি আমাদের মনে এ সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন আসতে পারে। এ সকল প্রশ্ন থেকে এমন একটি প্রশ্ন বেছে নেই যার উত্তর পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের মাধ্যমে পেতে চাই।
অনুমান	পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে প্রশ্নটির সম্ভাব্য উত্তর ঠিক করি এবং খাতায় লিখি। এটিই অনুমান।
পরীক্ষণ	অনুমানটি সঠিক কি না তা যাচাই করার জন্য একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা করি। পরীক্ষাটি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করি। পরীক্ষাটি সম্পাদন করি। তথ্য সংগ্রহ করে পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করি।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ	প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করি এবং ফলাফলের সারসংক্ষেপ করি। ফলাফলটি অনুমানের সাথে মিলেছে কিনা তা যাচাই করি। নিশ্চিত কোনো ফলাফল পাওয়া নাও যেতে পারে।
বিনিময়	প্রাপ্ত ফলাফল এবং গৃহিত সিদ্ধান্ত অন্যদের সাথে বিনিময় করি।

প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ জীবনের মানোন্নয়নে বিভিন্ন পণ্য, যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। যেমন- বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করে এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবার ফ্রিজ, টেলিভিশন, মোবাইল এবং বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবনে কাজে লাগানো হয়েছে। নানান ক্ষেত্র যেমন– শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, যাতায়াত ইত্যাদিতে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানের ব্যবহার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও আমাদের জীবনে দুইয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এরা পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

প্রাচীনকালের হাতিয়ার

অতীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় ছিল না। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেখানে ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁরা বিদ্যুৎ এবং আলোর মতো বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবিষ্কার করেছেন। অপরদিকে, জীবনকে উন্নত করার লক্ষ্যে বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে। তারা পাথরের হাতিয়ার, আগুন, পোশাক, ধাতব যন্ত্রপাতি এবং চাকার মতো সরল প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে।

মাইক্রোস্কোপ

আঠারো শতকে **শিল্পবিপ্লবের** সময়কালে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে, বিশেষ করে কৃষি, শিল্পকারখানা, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছে। এই বাষ্পীয় ইঞ্জিন কলকারখানা, রেলগাড়ি ও জাহাজ চালাতে ব্যবহার করা হতো।

আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র

বিভিন্ন পণ্য এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মানুষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে থাকে। আবার প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার সময়ও বিজ্ঞানীরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন– দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশের বিভিন্ন দূরবর্তী বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। খালি চোখে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্র জিনিস অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। এভাবে বর্তমানকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

২. কৃষিতে প্রযুক্তি

খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে।

যান্ত্রিক প্রযুক্তি

চাষাবাদের জন্য মানুষ বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি যেমন– শাবল, কোদাল, লাঙল উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে ট্র্যাক্টর, সেচ পাম্প বা ফসল মাড়াইয়ের যন্ত্রের মতো আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি মানুষ ব্যবহার করছে। এই সব যন্ত্রপাতি মানুষকে স্বল্প সময়ে অধিক খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করছে।

ট্র্যাক্টর

রাসায়নিক প্রযুক্তি

বাড়তি উৎপাদনের জন্য অনেক ফসলে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক সার উদ্ভিদের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধিতে এবং অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে। রাসায়নিক পদার্থ ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও আগাছা দমন করে অধিক খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে।

কীটনাশক ব্যবহার

জৈব প্রযুক্তি

মানুষের কল্যাণে নতুন কিছু উৎপাদনে জীবের ব্যবহারই হলো **জৈব প্রযুক্তি**। যেমন– জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তি মানুষকে অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ, পোকামাকড় প্রতিরোধী এবং অধিক ফলনশীল উদ্ভিদ উৎপাদনে সহায়তা করছে।

জৈব প্রযুক্তি নতুন শস্য উৎপাদনে সাহায্য করে

আলোচনা

◆ **কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার কীভাবে খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করছে ?**

১. নিচের ছকটির মতো করে একটি ছক তৈরি করি।

কৃষি প্রযুক্তি	কীভাবে খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে
যান্ত্রিক প্রযুক্তি	
রাসায়নিক প্রযুক্তি	
জৈব প্রযুক্তি	

২. খাদ্য উৎপাদনে কৃষি প্রযুক্তি কীভাবে সাহায্য করে তার তালিকা তৈরি করি।

৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

২০২৫

৩. প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব

প্রযুক্তি বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে মানুষের জীবনকে নিরাপদ, উন্নত ও আরামদায়ক করেছে। প্রযুক্তি আবার নানারকম সমস্যাও সৃষ্টি করছে।

পরিবেশ দূষণ

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করি কিন্তু এর ফলে বায়ুও দূষিত হয়। বায়ু দূষণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও এসিড বৃষ্টির মতো পরিবেশের উপর বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করছে। রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক অধিক খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে। এগুলো ব্যবহারের ফলে আবার মাটি এবং পানি দূষিত হয় যা জীবের জন্য মারাত্মক রকম ক্ষতিকর।

পরিবেশ দূষণ

অস্ত্র তৈরি

আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রয়োগ হলো যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি ও এর ব্যবহার, যেমন– বন্দুক, বোমা, ট্যাংক ইত্যাদি।

ট্যাংক

অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব

অনেক সময় প্রযুক্তির ব্যবহার নেশায় পরিণত হয়। টেলিভিশন ও কম্পিউটারের ব্যবহার যদি ভালো কাজে নিয়োজিত না হয়, তা আমাদের সময়ের অপচয় ঘটায়। নিয়মিত খেলাধুলা, ব্যায়াম ও মুক্তচিন্তার পথে প্রযুক্তি বাধা সৃষ্টি করে। এক নাগাড়ে এক ঘণ্টার বেশি টেলিভিশন দেখা বা কম্পিউটার ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

◆ প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব কী কী?

১. নিচে ছকের মতো করে একটি ছক তৈরি করি।

প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

২. ছকে প্রযুক্তির বিরূপ প্রভাবসমূহের একটি তালিকা তৈরি করি।

৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) কোনটি সঠিক?

ক. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একই বিষয়
খ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই
গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাঝে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে
ঘ. প্রযুক্তির জন্য বিজ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই

২) শিল্পবিপ্লব কখন হয়েছিল?

ক. ১৭ শতক   খ. ১৮ শতক
গ. ১৯ শতক   ঘ. ২০ শতক

৩) কোনটি রাসায়নিক প্রযুক্তি?

ক. সার   খ. ট্র্যাক্টর
গ.উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদ   ঘ. সেচ পাম্প

৪) নিচের কোনটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ?

ক. অধ্যয়ন   খ. অনুশীলন
গ. লেখা   ঘ. পর্যবেক্ষণ

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) বিজ্ঞানীরা কীভাবে প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেন ?
২) অল্প সময়ে অধিক উৎপাদনের জন্য মানুষ কোন কোন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ?
৩) প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাবের দুইটি উদাহরণ দাও।
৪) মহাকাশ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের জন্য বিজ্ঞানীরা কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেন ?
৫) জলীয় বাষ্পের ক্ষমতা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কীভাবে কাজে লাগানো হয়েছে ?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পার্থক্য ব্যাখ্যা করি।
২) কৃষি প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের জীবনমান উন্নত করে?
৩) প্রযুক্তি কীভাবে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করে ?
৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও তারা কীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যাখ্যা করি।

অধ্যায় ১০

আমাদের জীবনে তথ্য

প্রতিদিন আমরা প্রচুর তথ্য পাই। এই তথ্য প্রতিনিয়তই বাড়ছে। কিছু তথ্য সঠিক আবার কিছু তথ্য সঠিক নয়। তথ্য খুঁজে পেতে, বুঝতে, মূল্যায়ন ও ব্যবহার করতে আমাদের যথাযথ দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

১. তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব

প্রশ্ন : তথ্য বিনিময় কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

কাজ : কী হবে যদি তথ্যটি আমাদের জানা না থাকে ?

কী করতে হবে :

১. নিচে দেখানো ছকের মতো একটি ছক তৈরি করি।

তথ্য	কী হবে ?

২. যত বেশি সম্ভব তথ্যের একটি তালিকা ছকে লিখি।

৩. ছকে লেখা তথ্যটি যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে কী ঘটবে ?

৪. এ ব্যাপারে ধারণাগুলো ছকে লিখি।

৫. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

২০২৫

সারসংক্ষেপ

আমাদের জীবনে তথ্যের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তথ্য আমাদের নতুন কিছু শিখতে ও কী করতে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তাই আমাদের তথ্য জানতে হবে এবং সকলের সাথে তা বিনিময় করতে হবে। **তথ্য বিনিময়** হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো তথ্য বন্ধু, পরিবার এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আদান প্রদান করা হয়। তথ্য বিনিময় আমাদের নিরাপদ থাকতে, ভালোভাবে বাঁচতে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

তথ্য বিনিময় আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে সংক্রামক রোগ যেমন–ফ্লু ছড়িয়ে পড়তে পারে এই তথ্যটি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হলে ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে। মানুষ এই তথ্যটি জানতে পেরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগ থেকে রক্ষা পাবে। আবার মনে কর, আবহাওয়াবিদরা জানালেন যে, প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস হবে। এই তথ্যটি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হলে সমুদ্র উপকূলের অনেক মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা পাবে। সমুদ্রের মাছ ধরার ট্রলার ও জাহাজগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করতে পারবে।

তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষতি কমানো যায়

আমরা বিভিন্নভাবে তথ্য বিনিময় করতে পারি। যেমন– অন্যের সাথে কথা বলে, চিঠি লিখে ইত্যাদি। বর্তমানে **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)** তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ইমেইল, টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল ফোন ইত্যাদি হলো আইসিটি। আইসিটি মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ করেছে। আইসিটি ব্যবহার করে সহজেই তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিনিময়, বিস্তার ও ব্যবহার করা যায়।

আইসিটি তথ্য বিনিময় সহজে করছে

২. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিময়

প্রশ্ন : প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা কীভাবে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিময় করতে পারি?

(১) ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা কীভাবে সহজে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি ?

আমরা বই, খবরের কাগজ, টেলিভিশন অথবা রেডিওর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। তবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা অনেক সহজ। **ইন্টারনেট** হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের কম্পিউটারগুলোকে সংযুক্তকারী বিশাল নেটওয়ার্ক। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যটি কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে সহজেই পেতে পারি। এছাড়া এতে নিজস্ব উদ্ভাবন ও সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করতে পারি।

ইন্টারনেট   মোবাইল ফোন

নিচে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কিছু মৌলিক ধাপ দেওয়া হলো–

১) search ইঞ্জিন যেমন– গুগল (google), ইয়াহু (yahoo), পিপীলিকা (pipilika) ইত্যাদি ব্যবহার করি।

২) যে বিষয়ের তথ্যটি অনুসন্ধান করছি সে বিষয় সম্পর্কিত "মূল শব্দটি" "Search Bar" এ লিখে "search" লেখাটিতে ক্লিক করি অথবা "Enter key" – তে চাপ দেই।

৩) সার্চ ইঞ্জিনে ওয়েবসাইটের যে তালিকাটি এসেছে সেখান থেকে ওয়েবসাইট বেছে নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যটি সংগ্রহ করি।

৪) যতবার প্রয়োজন ততবার পূর্বের ধাপগুলো পুনরাবৃত্তি করি। অথবা আরও সুনির্দিষ্ট 'মূল শব্দ' নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় তথ্যটি অনুসন্ধান করি।

সার্চ ইঞ্জিন: Google   ওয়েবসাইট

(২) কীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করব

ইন্টারনেটে তথ্যটি অনুসন্ধানের পর প্রাপ্ত তথ্যটি আমরা খাতায় লিখে, ছবি তুলে, ভিডিও রেকর্ড করে সংরক্ষণ করতে পারি। বর্তমানে আমরা তথ্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি যেমন– পেন ড্রাইভ, সিডি, ডিভিডি, মেমোরি কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করি।

তথ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি

(৩) কীভাবে প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য বিনিময় করব ?

প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে অন্যদের সাথে তথ্য বিনিময় করতে পারি তা আমরা চতুর্থ শ্রেণিতে শিখেছি। টেলিফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে আমরা মানুষের সাথে কথা বলতে পারি। তথ্য আদান প্রদানের জন্য চিঠি লিখতে পারি। ক্যামেরার মাধ্যমে আমরা ছবি তুলে বা ভিডিও করে তথ্য বিনিময় করতে পারি। বর্তমানে খুদেবার্তা (এসএমএস), ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন– ফেসবুক বা টুইটার ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমেও তথ্য আদান প্রদান করতে পারি।

কাজ : তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিময়

কী করতে হবে :

১. শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করি।
২. কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করব, কোন উৎস থেকে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংগ্রহ করব এবং কীভাবে তা সংরক্ষণ করব দলে আলোচনার মাধ্যমে সে ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা করি।
৩. পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করি।
৪. প্রাপ্ত তথ্য যন্ত্র বা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবার সাথে বিনিময় করি।

২০২৫

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) তথ্য সংরক্ষণের জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয় ?

ক. টিভি
খ. রেডিও
গ. সংবাদপত্র
ঘ. সিডি

২) তথ্য বিনিময়ের জন্য কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় ?

ক. বাস
খ. থার্মোমিটার
গ. মোবাইল ফোন
ঘ. ঘড়ি

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) তিনটি তথ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তির নাম লিখি।

২) কোন প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য বিনিময় করা যায় ?

তথ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

ইন্টারনেট কী ?

৫) বাংলাদেশে ব্যবহৃত তিনটি “Search engine” এর নাম লিখি।

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) “বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আসছে”- এই তথ্যটি তুমি টেলিভিশন থেকে পেলে। এখন তুমি কী করবে ?

২) কীভাবে আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করব তা বর্ণনা করি।

৩) তথ্য বিনিময় না করলে কী হতে পারে ব্যাখ্যা করি।

৪) তোমার একজন বন্ধু জাপানে থাকে। তুমি তার সাথে তথ্য বিনিময় করতে চাও। কোন কোন উপায়ে তুমি তার সাথে তথ্য বিনিময় করতে পার? এর জন্য তোমার কী কী প্রযুক্তির দরকার হবে ?

অধ্যায় ১১

আবহাওয়া ও জলবায়ু

আমরা কোন কাপড় পরব বা কী করব তা ঐ দিনের আবহাওয়া দেখে ঠিক করি। আবার জলবায়ুর ধারণা কাজে লাগিয়ে কখন কোন ফসল চাষ করব তা ঠিক করতে পারি।

১. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যকার সম্পর্ক

প্রশ্ন : তুমি কীভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবহার করবে?

কাজ : আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবহার

কী করতে হবে :

১. নিচের আবহাওয়ার পূর্বাভাস থেকে ঢাকায় কোন ধরনের আবহাওয়া আশা করতে পারি?
২. নিচের আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী বাংলাদেশের কোথায় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ এবং কোথায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ?
৩. নিচের আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী রংপুরে ভ্রমণ করার সময় তুমি কি ছাতা ব্যবহার করবে ?

২৪/০২/২০১৫ তারিখের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আলোচনা

◆ **বছরের কোন সময়টি বনভোজনের জন্য উপযুক্ত ? কেন ?**

১. ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের আবহাওয়া সাধারণত কেমন থাকে ?

২. আগামী বছরের এপ্রিল মাসের আবহাওয়া কেমন থাকতে পারে তা কীভাবে আগে থেকে অনুমান করা যায় ?

সারসংক্ষেপ

আবহাওয়া

আবহাওয়া হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের আকাশ ও বায়ুমণ্ডলের সাময়িক অবস্থা। এই জন্যই দেশের বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া দিনের বিভিন্ন সময় ভিন্ন হয়। কোন দিন কোন কাপড় পরব এবং ছুটির দিন কী করব তা ঠিক করতে আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবহার করতে পারি ।

জলবায়ু

জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। তাই বছরের কোনো সময়ের আবহাওয়া কেমন হতে পারে তা আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জলবায়ুর ধারণা থেকে অনুমান করতে পারি। যদিও আমাদের অনুমান সব সময় সঠিক নাও হতে পারে। কারণ আবহাওয়া সবসময় পরিবর্তনশীল।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তবে আবহাওয়া ও জলবায়ু এক নয়। আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের আকাশ ও বায়ুমণ্ডলের সাময়িক অবস্থা। আর জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার সামগ্রিক অবস্থা।

বাংলাদেশের জলবায়ু অনুযায়ী বর্ষা শুরু হয় জুনের মাঝামাঝি (আষাঢ়ের শুরু) এবং শেষ হয় আগস্ট (শ্রাবণ–ভাদ্র) মাসে। বর্ষায় বৃষ্টি শুরুর সময় প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয়। তবে বর্ষা ঋতু শুরু হওয়ার সম্ভাব্য সময়টি আমরা জানি জলবায়ুর ধারণা থেকে।

২. বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ

বায়ুচাপ

বায়ু তার ওজনের কারণে ভূপৃষ্ঠের উপর যে চাপ প্রয়োগ করে তাই বায়ুচাপ। বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়।

প্রশ্ন : বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ সৃষ্টির কারণ কী?

কাজ : বালি ও পানি গরম করা

কী করতে হবে :

১. একটি ট্রে ১ সে.মি. পুরু বালি ও অন্য একটি ট্রে ১ সে.মি গভীর পানি দ্বারা পূর্ণ করি।
২. যদি সম্ভব হয়, বালি ও পানি পূর্ণ ট্রে দুইটিতে থার্মোমিটার রাখি।
৩. বালি ও পানির তাপমাত্রা হাত দিয়ে যাচাই করি।
৪. ট্রে দুইটিকে রৌদ্রোজ্জ্বল স্থানে রাখি।
৫. কোন ট্রে–টি দ্রুত গরম হবে অনুমান করি ?
৬. ২০ থেকে ৩০ মিনিট পর পুনরায় হাত দিয়ে পানি ও বালির তাপমাত্রা যাচাই করি এবং পূর্বের অনুমান সঠিক কিনা নিশ্চিত হই। সম্ভব হলে থার্মোমিটারের সাহায্যে বালি ও পানির তাপমাত্রা যাচাই করি।
৭. ট্রে দুইটিকে ঠান্ডা ছায়াযুক্ত স্থানে ১ ঘণ্টার মতো রেখে দেই।

দ্রষ্টব্য: একই তাপমাত্রার জন্য পরীক্ষাটি শুরুর পূর্বে বালি ও পানি শ্রেণিকক্ষে অন্ততপক্ষে ১ দিন রেখে দিতে হবে। তাছাড়া বালি শুকনো হতে হবে।

সারসংক্ষেপ

সূর্যের আলোতে রাখার পর বালির ট্রে-টি পানির ট্রের চেয়ে দ্রুত গরম হয়েছে। আবার ছায়ায় বালির ট্রে-টি পানির ট্রে অপেক্ষা দ্রুত ঠান্ডা হয়েছে। এই পরীক্ষা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বালি বা মাটি পানি অপেক্ষা দ্রুত গরম বা ঠান্ডা হয়।

উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ

দিনে স্থলভাগ জলভাগ থেকে উষ্ণ থাকে। উষ্ণ স্থলভাগ তার উপরে থাকা বাতাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। বায়ু উষ্ণ হলে তা হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে ঐ স্থান ফাঁকা হয়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। অপর দিকে সমুদ্রের উপরের বায়ু স্থলভাগ থেকে ঠান্ডা হওয়ার কারণে তা ভারী হয়ে নিচে নেমে আসে। এর ফলে সমুদ্রের উপর বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। নিম্নচাপ অঞ্চলের গরম বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। এর ফলে সৃষ্ট ফাঁকা স্থান পূরণের জন্য উচ্চচাপ অঞ্চলের শীতল বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। রাতে স্থলভাগ সমুদ্রের তুলনায় ঠান্ডা থাকে। তাই তখন স্থলভাগে বায়ুর উচ্চচাপ ও সমুদ্রে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। বর্ষাকালে অর্থাৎ জুন থেকে আগস্ট মাসে বাংলাদেশের স্থলভাগ বঙ্গোপসাগরের চেয়ে উষ্ণ থাকে। শীতকালে অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের স্থলভাগ বঙ্গোপসাগর থেকে শীতল থাকে। স্থলভাগ ও জলভাগের তাপমাত্রার এই বিপরীত অবস্থাই বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ সৃষ্টি করে। ফলে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু

৩. আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান

আমরা আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান যেমন– তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, মেঘ, বৃষ্টিপাত ও বায়ুচাপ সম্পর্কে জেনেছি। আবহাওয়ার এই উপাদানগুলো জলবায়ুরও উপাদান।

প্রশ্ন : আবহাওয়ার উপাদানগুলোর মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে?

কাজ : আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত

কী করতে হবে :

১. নিচের ছকে ঢাকার মাসিক গড় বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা লক্ষ করি।
২. বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করি। বর্ষাকাল ও শীতকালের অবস্থা তুলনা করি।
৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

	মাসিক গড় বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)	মাসিক গড় আর্দ্রতা (%)
জানুয়ারি	৮	৫৪
ফেব্রুয়ারি	৩২	৪৯
মার্চ	৬১	৪৫
এপ্রিল	১৩৭	৫৫
মে	২৪৫	৭২
জুন	৩১৫	৭৯
জুলাই	৩২৯	৭৯
আগস্ট	৩৩৭	৭৮
সেপ্টেম্বর	২৪৮	৭৮
অক্টোবর	১৩৪	৭২
নভেম্বর	২৪	৬৬
ডিসেম্বর	৫	৬৩

সারসংক্ষেপ

আর্দ্রতা হলো বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ। বাতাসের জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যত কমে, আর্দ্রতাও তত কমে। বর্ষাকালে মাসিক গড় আর্দ্রতার পরিমাণ ও মাসিক গড় বৃষ্টিপাত অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশি। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে। এই জলীয়বাষ্প ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু শীতকালে উত্তর দিক থেকে শুষ্ক শীতল বাতাস বয়ে আনে।

৪. বিরূপ আবহাওয়া

আবহাওয়ার প্রতিটি উপাদান প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। আবহাওয়ার কোনো উপাদান যখন অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হয় তখন আমরা বিরূপ আবহাওয়া দেখতে পাই। বিরূপ আবহাওয়ার কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হই। যেমন– মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হয়। কখনো কখনো মানুষ মারা যায়।

তাপদাহ ও শৈত্যপ্রবাহ

অতি গরম আবহাওয়ার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থাই হলো তাপপ্রবাহ। আমরা প্রতি বছরই তাপপ্রবাহ অনুভব করি। তবে অস্বাভাবিক ও অসহনীয় তাপপ্রবাহ শত বছরে একবার দেখতে পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহের ফলে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। আবার এই তাপপ্রবাহের কারণে কখনো কখনো মানুষসহ হাজার হাজার জীবের মৃত্যু হয়।

উত্তরের শুষ্ক ও শীতল বায়ু আমাদের দেশের উপর দিয়ে প্রবাহের ফলে শীতকালে তাপমাত্রা কখনো কখনো অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। এই অবস্থাই হলো **শৈত্যপ্রবাহ**। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য অসহনীয় শৈত্যপ্রবাহ বাংলাদেশে খুব কমই দেখা যায়।

বন্যা ও খরা

বর্ষাকালে অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের এক পঞ্চমাংশ পানিতে তলিয়ে যায়। তবে ভয়াবহ বন্যার সময় বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ পানির নিচে তলিয়ে যায়। বাংলাদেশের জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির কারণে এমনটি হয়ে থাকে।

অনেক লম্বা সময় শুষ্ক আবহাওয়া থাকলে **খরা** দেখা দেয়। অস্বাভাবিক কম বৃষ্টিপাত ও উচ্চ তাপমাত্রাই হলো খরার কারণ। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খরা সৃষ্টি হয়।

বন্যা

খরা

কালবৈশাখী

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে যে বজ্রঝড় হয় তাই কালবৈশাখী নামে পরিচিত। স্থলভাগ অত্যন্ত গরম হওয়ার ফলেই কালবৈশাখীর সৃষ্টি হয়। সাধারণত বিকেল বেলায় কালবৈশাখী ঝড় বেশি হয়। এ ঝড় সর্বোচ্চ ২০ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। সঞ্চারণশীল ধূসর মেঘ সোজা উপরে উঠে গিয়ে জমা হয়। পরবর্তীতে এই মেঘ ঘনীভূত হয়ে ঝড়ো হাওয়া, ভারী বৃষ্টি, বজ্রবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি সৃষ্টি করে। এটাই কালবৈশাখী।

টর্নেডো

টর্নেডো হলো সরু, ফানেল আকৃতির ঘূর্ণায়মান শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ। এই বায়ুপ্রবাহ আকাশের বজ্রমেঘের স্তর থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। টর্নেডো আকারে সাধারণত এক কিলোমিটারের কম হয়। টর্নেডোর ফলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। যেমন– ঘরবাড়ির ছাদ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, দেয়াল ভেঙে যেতে পারে এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। শক্তিশালী টর্নেডো বড় বড় স্থাপনা ভেঙে ফেলতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন

ঘূর্ণিঝড় হলো নিম্নচাপের ফলে সৃষ্ট ঘূর্ণায়মান সামুদ্রিক বজ্রঝড়। এটি ৫০০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়। অত্যধিক গরমের ফলে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের পানি ব্যাপক হারে বাষ্পে পরিণত হয়। এর ফলে ঐ সকল স্থানে সৃষ্ট নিম্নচাপ থেকেই তৈরি হয় ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় দমকা হাওয়া বইতে থাকে ও মুষলধারে বৃষ্টি হতে থাকে। কখনো কখনো ঘূর্ণিঝড়ের ফলে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে লোকালয় প্লাবিত হয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। মাঝে মাঝে জলোচ্ছ্বাসের ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে তীব্র জোয়ারের সৃষ্টি হয় এবং সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ঘূর্ণিঝড়

টর্নেডো

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) বায়ুর তাপমাত্রা বলতে কী বোঝায় ?

ক. বায়ু কতটা গরম বা ঠান্ডা
খ. বায়ুতে জলীয়বাষ্প কম না বেশি
গ. বায়ু হালকা বা ভারী
ঘ. সূর্যের আলো বেশি না কম

২) বায়ুর চাপ অত্যধিক কমে গেলে কী ঘটে ?

ক. ঝড়
খ. বৃষ্টি
গ. কুয়াশা
ঘ. শৈত্যপ্রবাহ

৩) বাংলাদেশে প্রতি বছর কোনটি দেখা যায় ?

ক. বন্যা
খ. ভূমিকম্প
গ. তাপপ্রবাহ
ঘ. তুষারপাত

৪) আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কিসের ?

ক. সময়
খ. স্থান
গ. দিক
ঘ. শক্তি

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) বাংলাদেশের তিনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম লিখি।
২) আবহাওয়া কী ?
৩) আবহাওয়ার উপাদানগুলো কী কী ?
৪) সাধারণত কোন সময়ে সমুদ্র থেকে স্থলভাগে বায়ু প্রবাহিত হয় ?
৫) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস কীভাবে সাহায্য করে ?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) বায়ুচাপ কী ?
২) কীভাবে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় ?
৩) বাংলাদেশে কেন বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাত হয় ?
৪) কালবৈশাখী ঝড়ের কারণ ব্যাখ্যা করি।
৫) আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে মিল ও অমিল কোথায় ?
৬) **জানুয়ারি** এবং **জুলাই** মাসের মধ্যে কোন মাসটি বনভোজনের জন্য উপযুক্ত? কেন ?

অধ্যায় ১২

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু হলো আবহাওয়ার দীর্ঘ সময়ের গড় অবস্থা। কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া কখনো স্বাভাবিক থাকতে পারে আবার কখনো চরম অবস্থা দেখা দিতে পারে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তন ঐ অঞ্চলের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, কালবৈশাখী বা ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা দ্বারা নির্ণয় করা যায়। আবহাওয়ার এই ভিন্নতা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। অপরদিকে, আবহাওয়ার উপাদানগুলোর উল্লেখযোগ্য স্থায়ী পরিবর্তন হলো **জলবায়ু পরিবর্তন**। কোনো স্থানের জলবায়ু হঠাৎ পরিবর্তন হয় না। তবে আমরা এখন জলবায়ু পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারি। চলো বিষয়টি যাচাই করা যাক।

১. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

পৃথিবীর সকল স্থানের তাপমাত্রা নির্ণয় করে গড় করার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা নির্ণয় করতে পারি।

প্রশ্ন : পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার কি কোনো পরিবর্তন হচ্ছে?
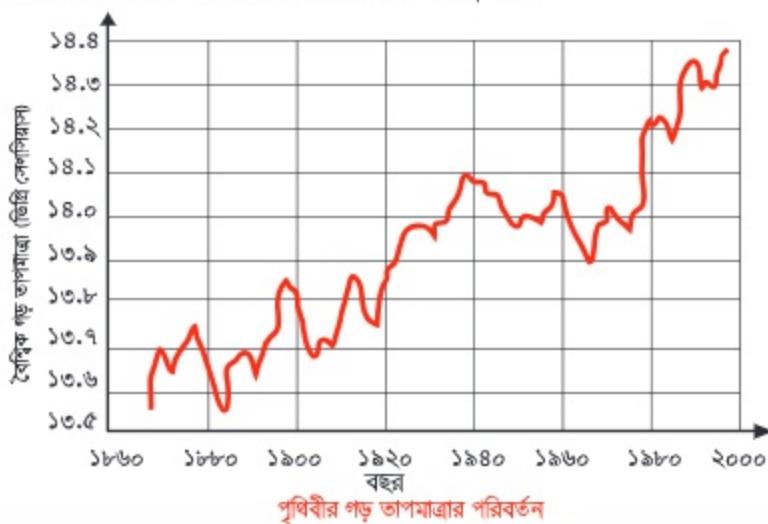
পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার পরিবর্তন
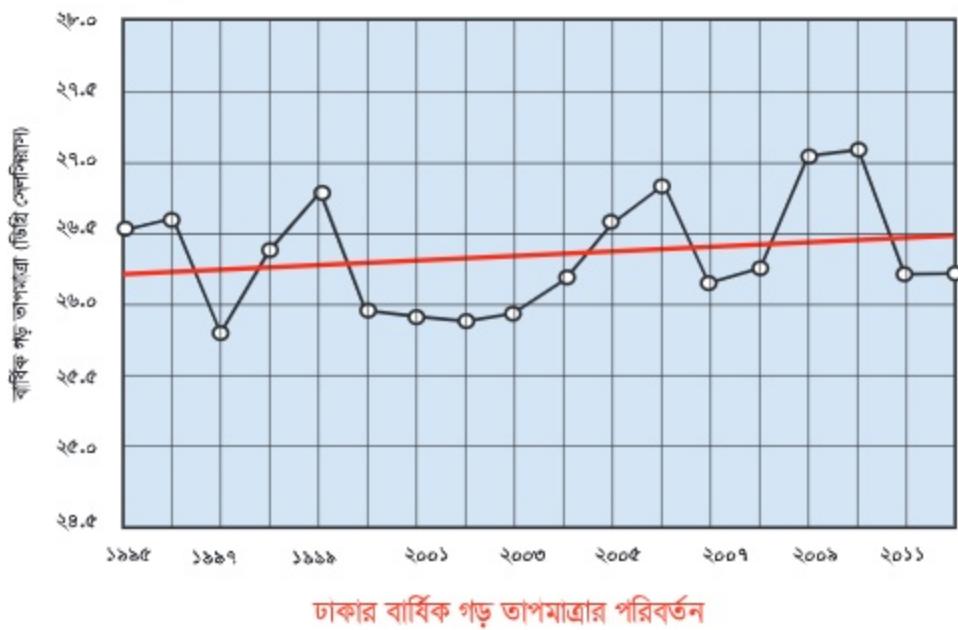
সারসংক্ষেপ

লেখচিত্রটিতে দেখা গেল, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রতি বছর উঠানামা করছে। তবে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যাওয়াকে **বৈশ্বিক উষ্ণায়ন** বলে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন ঘটছে। যেমন– বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে যাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে পৃথিবীর জলবায়ুও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে।

নিচের লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ঢাকার গড় তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে।

ঢাকার বার্ষিক গড় তাপমাত্রার পরিবর্তন

আলোচনা

◆ পূর্ব অভিজ্ঞতা ও এই অধ্যায়ে যা শিখলাম তার আলোকে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

১. তোমার কি মনে হয় জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে? কেন এমন মনে হচ্ছে? প্রমাণসহ তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

২. যদি মনে করো জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে, তবে জলবায়ুর এই পরিবর্তন কী আমাদের জন্য ভালো না খারাপ ?

২. গ্রিন হাউজ প্রভাব

প্রশ্ন : বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ কী ?

কাজ : গ্রিন হাউজ প্রভাব

কী করতে হবে:

১. দুইটি পেট্রি ডিশে তিনটি করে বরফ খণ্ড রাখি।
২. একটি পেট্রি ডিশ কাচের গ্লাস বা বিকার দিয়ে ঢেকে দেই।
৩. পেট্রি ডিশ দুইটিকে সূর্যের আলোতে রাখি। কোন ডিশটির বরফ আগে গলবে তা অনুমান করি।
৪. এবার ৩০ মিনিট অপেক্ষা করি।
৫. কোনটির বরফ আগে গলছে তা পর্যবেক্ষণ করি। অনুমানটি কি সঠিক হয়েছে ?

দ্রষ্টব্য: কাজটি পেট্রি ডিশের পরিবর্তে কাচের গ্লাস এবং বিকারের পরিবর্তে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করেও করা যাবে।

সারসংক্ষেপ

দেখা গেলো যে, বিকার দিয়ে ঢেকে রাখা বরফখণ্ডগুলো খোলা বাতাসে রাখা বরফখণ্ডের তুলনায় আগে গলেছে। সূর্যের তাপ সহজেই বিকারের ভিতর প্রবেশ করতে পারে কিন্তু বিকার থেকে সহজে বের হতে পারে না। ফলে বিকারের ভিতর দ্রুত গরম হয়ে ওঠে। আর এটিই হলো গ্রিন হাউজ ধারণার মূল বিষয়। গ্রিন হাউজ হলো কাচের তৈরি ঘর যা ভেতরে সূর্যের তাপ আটকে রাখে। ফলে তীব্র শীতেও গাছপালা এই ঘরের ভিতর উষ্ণ ও সজীব থাকে।

গ্রিন হাউজ

গ্রিন হাউজ প্রভাব ও গ্রিন হাউজ গ্যাস

গ্রিন হাউজ প্রভাব

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলও গ্রিন হাউজের ন্যায় কাজ করে। **বায়ুমণ্ডল** হলো পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বায়ুর স্তর। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস গ্রিন হাউজের কাচের দেয়ালের মতো কাজ করে। দিনের বেলায় সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে এবং ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। রাতে ভূপৃষ্ঠ থেকে সেই তাপ বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে এবং ভূপৃষ্ঠ শীতল হয়। কিন্তু কিছু তাপ বায়ুমণ্ডলের ঐ গ্যাসগুলোর কারণে আটকা পড়ে। ফলে রাতের বেলায়ও পৃথিবী উষ্ণ থাকে। আর তাপ ধরে রাখার এই ঘটনাকেই **গ্রিন হাউজ প্রভাব** বলে। তাপ ধরে রাখার জন্য দায়ী এসকল গ্যাসই হলো গ্রিন হাউজ গ্যাস।

মানুষের কর্মকাণ্ড ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কলকারখানা ও যানবাহনে কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো হয়। এই জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে অনেক পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। পাশাপাশি বনভূমি ধ্বংসের ফলে গাছপালার মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের হার কমছে। ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। বেশি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি করে তাপ ধরে রাখছে। ফলে দিন দিন পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াই হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

বাস্তব ঘটনা থেকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন পর্যবেক্ষণ

তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আমরা হিমালয় পর্বতমালার হিমবাহ গলনের হার থেকেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারি। এছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে এবং সমুদ্রের পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হিমালয় পর্বতমালার ওপর হিমবাহ (বামপাশের ছবিটি ১৯২১ সালের, ডানপাশের ছবিটি ২০০৯ সালের।)

৩. জলবায়ু পরিবর্তন

প্রশ্ন : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় আমরা কী করতে পারি?
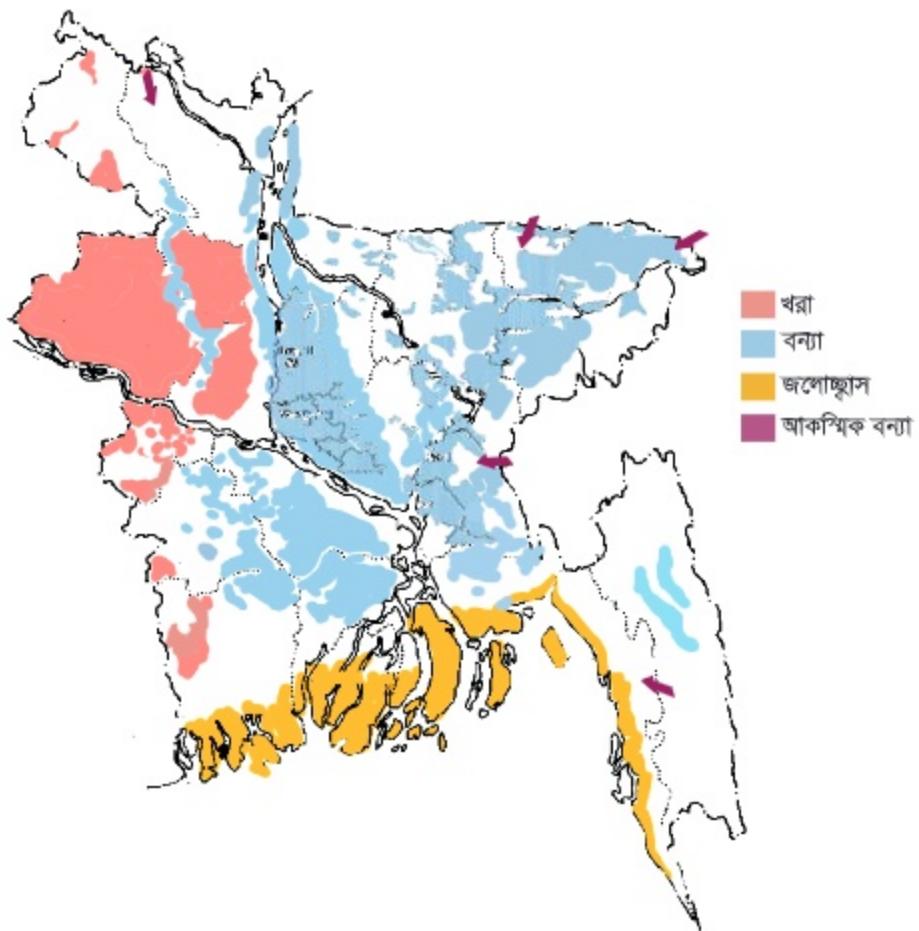
কাজ : অভিযোজনের উপায়

কী করতে হবে:

১. কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে ছোট ছোট দল তৈরি করি। নিচের মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করি। মানচিত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখানো হয়েছে।

২. নিজ নিজ এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ চিহ্নিত করি। দুর্যোগ মোকাবিলার বিভিন্ন প্রস্তুতি আলোচনা করি।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন জলবায়ুর এই পরিবর্তন বিভিন্ন প্রাকৃতিক সমস্যা সৃষ্টি করবে ও দুর্যোগকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে। জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে। যেমন–

- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হার ও মাত্রা বৃদ্ধি করবে।
- হঠাৎ ভারী বৃষ্টিপাত ও আকস্মিক বন্যা দেখা দেবে।
- বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে খরা দেখা দেবে।
- সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং নদীর পানিতে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য আমরা দুইটি কৌশল অবলম্বন করতে পারি। একটি হলো "জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো"। অপরটি "জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন "।

জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। সুতরাং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ কমিয়ে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে পারি। এজন্য কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে। নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন– সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াতে হবে। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আমরা বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড হ্রাস করতে পারি। দৈনন্দিন জীবনে শক্তির ব্যবহার কমিয়েও আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন কমাতে পারি। এই সকল কর্মকাণ্ড দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস করতে সহায়তা করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তবে জলবায়ুর যে পরিবর্তন ইতোমধ্যে ঘটেছে তার সাথে আমাদের খাপ খাওয়াতে হবে। পরিবর্তিত জলবায়ুতে বেঁচে থাকার জন্য গৃহীত কর্মসূচিই হলো 'জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন'। অভিযোজনের উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি কমানো ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমন–

- ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, কলকারখানা ইত্যাদি অবকাঠামোর উন্নয়ন;
- বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;
- উপকূলীয় বন সৃষ্টি ;
- লবণাক্ত পরিবেশে বাঁচতে পারে এমন ফসল উদ্ভাবন ;
- জীবন যাপনের ধরন পরিবর্তন ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কিত ধারণা সকলকে জানানো।

জলবায়ুর পরিবর্তন বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। ছবিতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিভিন্ন উপায় দেখানো হলো–

বৃক্ষরোপন

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

বাংলাদেশ পৃথিবীর দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হই। এ সকল দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, টর্নেডো, নদী ভাঙন ইত্যাদি। তাই আমাদের বাংলাদেশের জলবায়ু সম্পর্কে জানা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের দুর্যোগের তালিকা

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) নিচের কোনটি গ্রিন হাউজ গ্যাস ?

ক. নাইট্রোজেন	খ. অক্সিজেন
গ. কার্বন ডাইঅক্সাইড	ঘ. হাইড্রোজেন

২) জলবায়ু কীভাবে পরিবর্তিত হয় ?

ক. হঠাৎ	খ. দ্রুত
গ. মাঝে মাঝে	ঘ. ধীরে ধীরে

৩) কোনটি জলবায়ুর পরিবর্তন হ্রাস করে ?

ক. কয়লা ও তেলের ব্যবহার	খ. সৌর শক্তির ব্যবহার
গ. বনভূমি ধ্বংস	ঘ. প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

৪) নিচের কোনটি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় ?

ক. ঘূর্ণিঝড়	খ. হারিকেন
গ. কালবৈশাখী	ঘ. বন্যা

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কী ?
২) বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ কী ?
৩) বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি উদাহরণ দিই।
৪) পরিবেশের উপর বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব কী?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) গ্রিন হাউজের ভিতরের পরিবেশ গরম থাকে কেন? ব্যাখা করি।
২) জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো এবং এর সাথে খাপ খাওয়ানো কীভাবে সম্পর্কিত ?
৩) কীভাবে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমাতে পারি ?
৪) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল গ্রিন হাউজের কাচের মতো কাজ করে কেন ?
৫) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন কী ব্যাখ্যা করি।
৬) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে আমাদের জীবনে এর কী প্রভাব পড়বে?

অধ্যায় ১৩

প্রাকৃতিক সম্পদ

চারপাশে তাকালে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই। এগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। মানবসৃষ্ট সকল বস্তুই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

১. আমাদের সম্পদ

প্রশ্ন : আমাদের কী ধরনের সম্পদ রয়েছে ?

কাজ : কোনগুলো কোন ধরনের সম্পদ

কী করতে হবে :

১. নিচের ছকটির মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

প্রাকৃতিক সম্পদ	মানবসৃষ্ট সম্পদ

২. নিচের ছবিগুলো দেখে কোনটি প্রাকৃতিক এবং কোনটি মানবসৃষ্ট সম্পদ তা খুঁজে বের করে ছকে লিখি।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

সম্পদ হলো এমন কিছু, যা মানুষ ব্যবহার করে উপকৃত হয়। সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানবসৃষ্ট সম্পদ।

প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রকৃতিতে পাওয়া যে সকল সম্পদ মানুষ তার চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহার করে থাকে তাই **প্রাকৃতিক সম্পদ**। মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ তৈরি করতে পারে না। সূর্যের আলো, মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ। খনিজ সম্পদ, জীবাশ্ম জ্বালানি এসবও প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আমরা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং শক্তি পেয়ে থাকি।

প্রাকৃতিক সম্পদ

মানবসৃষ্ট সম্পদ

মানুষের তৈরি সম্পদই হলো **মানবসৃষ্ট সম্পদ**। কাগজ, প্লাস্টিক, কাচ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি মানবসৃষ্ট সম্পদ। মানবসৃষ্ট সম্পদও প্রকৃতি থেকেই আসে। গাছপালা ব্যবহার করে মানুষ নতুন কিছু তৈরি করে। গাছ থেকে পাওয়া কাঠ দিয়ে আমরা ঘরবাড়ি তৈরি করি। গাছ থেকে আমরা কাগজও পাই। আবার, বালি কেউ তৈরি করে না, এটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। আর এই বালি থেকে কাচ তৈরি হয়। মানবসৃষ্ট সম্পদ আবার অন্য সম্পদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

২. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার

শক্তি উৎপাদন এবং নতুন কিছু তৈরি করার জন্য আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদাও বাড়ছে। কিন্তু কিছু কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। যেমন– তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। আর তাই আমাদের এই সকল সম্পদের বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে। পাশাপাশি এর যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

সম্পদের বিকল্প উৎস

তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি অনবায়নযোগ্য সম্পদ। এ সকল সম্পদ একবার নিঃশেষ হলে হাজার হাজার বছরেও ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। অপর দিকে নবায়নযোগ্য সম্পদ বারবার ব্যবহার করা যায়। আর এই কারণে নবায়নযোগ্য সম্পদকে অনবায়নযোগ্য সম্পদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। নবায়নযোগ্য সম্পদ হিসেবে আমরা সূর্যের আলো, বায়ুপ্রবাহ এবং পানির স্রোত ব্যবহার করতে পারি। সূর্যের আলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অফুরন্ত শক্তির উৎস। সৌর প্যানেল ব্যবহার করে আমরা সূর্য থেকে বিদ্যুৎ শক্তি পাই। বায়ুপ্রবাহ শক্তির আরেকটি বিকল্প উৎস। বায়ুপ্রবাহ উইন্ডমিলের পাখা ঘোরানোর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।

সৌর প্যানেল

উইন্ডমিল

প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য এর যথাযথ ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শক্তির ব্যবহার কমিয়ে, বস্তুর পুনর্ব্যবহার এবং রিসাইকেল করার মাধ্যমে আমরা সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি। সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা ধীরে ধীরে পরিবেশ দূষণ কমাতে পারি।

আলোচনা

◆ **আমরা কীভাবে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারি?**

১. ডানপাশের ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।
২. কীভাবে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারি তার একটি তালিকা তৈরি করি।
৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

সম্পদের যথাযথ ব্যবহার

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) নিচের কোনটি প্রাকৃতিক সম্পদ ?

ক. বালি　　খ. কাগজ
গ. কাচ　　ঘ. বিদ্যুৎ

২) কোন সম্পদটি সীমিত ?

ক. সূর্যের আলো　　খ. কয়লা
গ. বায়ু　　ঘ. পানি

৩) সূর্য থেকে শক্তি পাওয়ার জন্য নিচের কোন প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হয় ?

ক. সৌর প্যানেল　　খ. টারবাইন
গ. বাঁধ　　ঘ. বৈদ্যুতিক পাখা

৪) নিচের কোনটি মানবসৃষ্ট সম্পদ?

ক. পাথর　　খ. পশুপাখি
গ. গাছপালা　　ঘ. কাচ

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) মানবসৃষ্ট সম্পদের ৫টি উদাহরণ দিই।
২) অনবায়নযোগ্য সম্পদের ৩টি বিকল্প সম্পদের উদাহরণ দিই।
৩) আমরা কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারি ?
৪) মানবসৃষ্ট সম্পদ কী ?
৫) মানবসৃষ্ট সম্পদ কোথা থেকে আসে ?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) অনবায়নযোগ্য সম্পদের বিকল্প হিসেবে কেন নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহার করা উচিত ?
২) প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার কেন প্রয়োজন ?
৩) প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসৃষ্ট সম্পদের মধ্যে মিল ও পার্থক্য কোথায় ?
৪) একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করতে তোমার কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসৃষ্ট সম্পদ প্রয়োজন হবে?

অধ্যায় ১৪

জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, ভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজনও বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাগুলো কী কী? এই সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান কি আমাদের কাছে আছে? এই সমস্যাগুলো আমরা কীভাবে সমাধান করতে পারি ?

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের চাহিদা

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব

১৮০০ সালের শুরুর দিকে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ কোটি। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৭০০ কোটি লোক বসবাস করে। অর্থাৎ ২০০ বছরে বিশ্বে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৬০০ কোটি। ২০১১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হয় ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। ১৯৭০ সালে জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৬০ লক্ষ। ৪০ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা (প্রায়)

বছর	জনসংখ্যা
১৯৬১	৫ কোটি ৫২ লক্ষ
১৯৭৪	৭ কোটি ৬৪ লক্ষ
১৯৮১	৮ কোটি ৯৯ লক্ষ
১৯৯১	১২ কোটি ১৪ লক্ষ
২০০১	১২ কোটি ৯৩ লক্ষ
২০১১	১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ
২০২২	১৬ কোটি ৫১ লক্ষ

জনসংখ্যার ঘনত্ব হলো প্রতি একক জায়গায় বসবাসরত মোট লোকসংখ্যা। মোট জনসংখ্যাকে ক্ষেত্রফল দ্বারা ভাগ করে খুব সহজেই জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে

আলোচনা

◆ বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?

১. বাংলাদেশের ক্ষেত্রফল ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। উপরের ছক অনুযায়ী, বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করি।

২. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

জনসংখ্যার ঘনত্ব =
মোট জনসংখ্যা ÷ ক্ষেত্রফল

(২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের চাহিদা

প্রশ্ন : যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের কী ঘটবে?

কাজ : **আমাদের কী প্রয়োজন?**

কী করতে হবে :
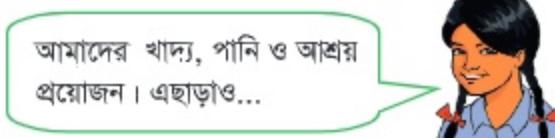
১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

বাড়তি জনসংখ্যার জন্য আমাদের আরও কী প্রয়োজন

২. যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের আরও কী প্রয়োজন হবে ছকে তার একটি তালিকা তৈরি করি।

৩. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কী প্রয়োজন ?

আমাদের খাদ্য, পানি ও আশ্রয় প্রয়োজন। এছাড়াও...

সারসংক্ষেপ

জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে মানুষের চাহিদাও তত বাড়বে। এতে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ বাড়বে। বাড়তি চাহিদা আমাদের জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং ভূমি ইত্যাদির ঘাটতি দেখা দেবে। মানুষ সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে। কারণ জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হলে জীবাণু দ্রুত ছড়ায়। চিকিৎসা এবং শিক্ষার সুযোগ কমে যেতে পারে। ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ কমে যেতে পারে।

মহামারী আকারে ডায়রিয়া

২. পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বাড়তি শস্য উৎপাদন এবং পশুপালনের জন্য মানুষ বন উজাড় করছে। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এবং কলকারখানা তৈরিতেও অধিক জমি ব্যবহার করছে। বনভূমি ধ্বংসের ফলে বাস্তুসংস্থানের পরিবর্তন হয়। জীবের আবাসস্থল ধ্বংস হয় এবং জীব ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। এছাড়া বনভূমি ধ্বংসের ফলে ভূমিক্ষয় এবং ভূমিধ্বস হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বাস্তুসংস্থানের পরিবর্তন

কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভিদের ভালো বৃদ্ধি এবং অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মাটি এবং পানি দূষিত হচ্ছে।

জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কলকারখানায় পণ্য তৈরি হয়। মানুষ যাতায়াতের জন্য যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে। কলকারখানা এবং যানবাহন থেকে নির্গত ক্ষতিকর গ্যাস বায়ু দূষিত করছে। ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এসিড বৃষ্টি হচ্ছে।

যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার

আলোচনা

◆ **জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশের উপর কী প্রভাব ফেলছে?**

১. নিচে দেখানো ছকের মতো খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

ক্ষতিকর প্রভাব	কারণ

২. ছকে পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাবের একটি তালিকা তৈরি করি এবং কারণগুলো লিখি।

৩. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

৩. জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান

বাড়তি মানুষের চাহিদা পূরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধিক খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করছে। মানুষ বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কম সময়ে বেশি খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে, জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক পুষ্টিসম্পন্ন, রোগ প্রতিরোধী এবং অধিক উৎপাদনশীল ফসল উদ্ভাবন করা হচ্ছে।

হাইব্রিড গাড়িতে ব্যবহৃত হয় তেল এবং বিদ্যুৎ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার কমিয়ে শক্তি সংরক্ষণে ও দূষণ কমাতে সহায়তা করে। মানুষ সৌর প্যানেলের মতো প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে যা নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এই প্রযুক্তি অনবায়নযোগ্য শক্তির বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যাতায়াতের জন্য নতুন প্রযুক্তি "হাইব্রিড গাড়ি" উদ্ভাবন করেছে। এই গাড়ি বিদ্যুৎ ও তেল উভয় জ্বালানি ব্যবহার করেই চলতে পারে। যা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে ভূমিকা রাখছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শেখা অত্যন্ত জরুরি। বিজ্ঞান শিক্ষা আমাদের আচরণ পরিবর্তনে এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আলোচনা

◆ **জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কীভাবে অবদান রাখছে ?**

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানে উন্নত প্রযুক্তি কীভাবে সাহায্য করবে ?

২. সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করি।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দিই।

১) নিচের কোনটি মানুষের মৌলিক চাহিদা ?

ক. বিনোদন　　খ. খাদ্য

গ. হাইব্রিড গাড়ি　　ঘ. খেলাধুলা

২) জনসংখ্যার ঘনত্ব হলো –

ক. প্রতি একক জায়গায় লোকসংখ্যা

খ. প্রতি মানুষের জন্য ভূমির পরিমাণ

গ. প্রতি একক ক্ষেত্রফলে মানুষের ওজন

ঘ. প্রতি মানুষের ওজনের জন্য ভূমির পরিমাণ

৩) কোনটি অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস ?

ক. পানি　　খ. গাছ

গ. বাতাস　　ঘ. কয়লা

৪) জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে কোনটি ঘটে ?

ক. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন　　খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি

গ. ভূমিকম্প　　ঘ. ভূমিক্ষয়

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কিসের চাহিদা বাড়বে ?

২) পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ৩টি ক্ষতিকর প্রভাব লিখি।

৩) অধিক খাদ্য উৎপাদনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কীভাবে অবদান রাখছে?

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) আমরা কেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিখছি ?

২) মানুষ কেন কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে ?

৩) বনভূমি ধ্বংসের ফলে পরিবেশের উপর কী প্রভাব পড়ছে ?

৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ কেন সহজেই রোগাক্রান্ত হয় ?

শব্দকোষ

শব্দ	শব্দের অর্থ	পৃষ্ঠা নম্বর
অক্ষ	পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর ছেদকারী কাল্পনিক রেখা।	৫৪
অক্সিজেন সিলিন্ডার	অক্সিজেন রাখার বিশেষ পাত্র।	২৬
অণু	দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্রিত হয়ে পদার্থ গঠনকারী যে কণা তৈরি করে।	৩৯
আর্দ্রতা	বাতাসে জলীয় বাষ্পের মোট পরিমাণ।	৭৭
আহ্নিক গতি	পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণনের গতি।	৫৪
আবাসস্থল	উদ্ভিদ যে স্থানে জন্মায় এবং প্রাণী যে বিশেষ জায়গায় বাস করে।	৩
আবহাওয়া	কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের আকাশ ও বায়ুমণ্ডলের সাময়িক অবস্থা।	৭৩
ইন্টারনেট	পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের কম্পিউটারগুলোকে সংযুক্তকারী বিশাল নেটওয়ার্ক।	৭০
উত্তর গোলার্ধ	পৃথিবীর উত্তরের অর্ধেক অংশ।	৫৮
উপগ্রহ	মহাকাশের যে বস্তু কোনো গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরে।	৬০
এইচআইভি (HIV)	এইডস রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু।	৪৮
এইডস	এইচআইভি জীবাণুর সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট একটি রোগ যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে।	৪৮
এসিড বৃষ্টি	ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত বৃষ্টি।	২৮
কক্ষপথ	যে নির্দিষ্ট পথে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহসমূহ সূর্যের চারদিকে ঘুরে।	৫৪
কীটনাশক	একটি রাসায়নিক পদার্থ যা ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত হয়।	১২
কৃত্রিম রং	খাদ্যকে আকর্ষণীয় করতে ব্যবহৃত রঙিন রাসায়নিক পদার্থ।	৪৫
খরা	দীর্ঘ সময় ধরে বিরাজমান বৃষ্টিপাতহীন শুষ্ক আবহাওয়া।	৭৮
খাদ্য জাল	দুই বা ততোধিক খাদ্য শৃঙ্খলের সমন্বয়ে সৃষ্ট জাল।	৭
খাদ্য শৃঙ্খল	বাস্তুসংস্থানে উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে শক্তি প্রবাহের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।	৭

গ্রিন হাউজ প্রভাব	জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে সূর্য থেকে আগত তাপ ধরে রাখার ঘটনা।	৮৪
ঘনীভবন	কোনো পদার্থ বায়বীয় বা গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া।	১৮
ছাঁকন	ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে পানি পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া।	২৩
চাঁদের দশা	চাঁদের আলোকিত অংশের আকৃতির দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল অবস্থা।	৫৯
জনসংখ্যার ঘনত্ব	প্রতি একক জায়গায় বসবাসরত মোট লোকসংখ্যা	৯৩
জলবায়ু	কোন নির্দিষ্ট স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা	৭৩
জলবায়ু পরিবর্তন	আবহাওয়ার উপাদানগুলোর উল্লেখযোগ্য স্থায়ী পরিবর্তন।	৮৬
জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো	পরিবর্তিত জলবায়ুতে বেঁচে থাকার জন্য গৃহীত কর্মসূচি। খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্য হলো জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি কমানো।	৮৬
জাঙ্ক ফুড	অত্যধিক চিনি, লবণ ও চর্বিযুক্ত খাদ্য যা খুব সহজে তৈরি করে পরিবেশন করা যায়।	৪৫
জলোচ্ছ্বাস	ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে সৃষ্ট তীব্র জোয়ার।	৭৯
জৈব প্রযুক্তি	মানুষের কল্যাণে নতুন কিছু উৎপাদনে জীবের ব্যবহার।	৬৫
জ্যোতির্বিজ্ঞান	মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণা।	৫৩
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	লম্বা নলের মতো যন্ত্র যা অনেক দূরের জিনিস দেখতে ব্যবহার করা হয়।	৫২
তথ্য বিনিময়	যে প্রক্রিয়ায় কোনো তথ্য বন্ধু, পরিবারের সদস্য বা অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আদান প্রদান করা হয়।	৬৯
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	যে প্রযুক্তিগুলো তথ্য খুঁজে পেতে, সংগ্রহ করতে, সংরক্ষণ করতে ও তথ্য বিনিময়ে ব্যবহৃত হয়।	৬৯
তাপ সঞ্চালন	গরম বস্তু থেকে ঠান্ডা বস্তুতে তাপ শক্তির প্রবাহ।	৩২
তাপপ্রবাহ	অতি গরম আবহাওয়ার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা।	৭৮
থিতানো	যে প্রক্রিয়ায় পানিকে দীর্ঘ সময় স্থির অবস্থায় রেখে বিভিন্ন ময়লা তলানি হিসেবে জমিয়ে আলাদা করার মাধ্যমে পানি পরিষ্কার করা হয়।	২৩

দিন	পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে থাকে সেই অংশের অবস্থা।	৫৪
নতুন আবাস	দলবদ্ধভাবে নতুন কোনো স্থানে উদ্ভিদ জন্মানো ও প্রাণীর বসবাসের ফলে নতুন আবাস গড়ে উঠা।	৫
পদার্থ	যার ওজন আছে ও জায়গা দখল করে।	৩৮
পরমাণু	পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা।	৩৯
পরাগায়ন	বীজ সৃষ্টির লক্ষ্যে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে পরাগরেণুর স্থানান্তর।	৫
পরিচলন	তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপের সঞ্চালন প্রক্রিয়া।	৩৫
পরিপাক	যে প্রক্রিয়ায় প্রাণীদেহে খাদ্য ভেঙে সরল ও শোষণ উপযোগী হয়।	১৬
পরিবহন	কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপের সঞ্চালন প্রক্রিয়া।	৩৫
পরিবেশ দূষণ	পরিবেশের পরিবর্তন যা জীবের জন্য ক্ষতিকর। বিভিন্ন ক্ষতিকর ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশে মেশার ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।	৯
পরিবেশ সংরক্ষণ	প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবহারই হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণ।	১৩
পানিবাহিত রোগ	যে সকল রোগ জীবাণু দ্বারা দূষিত পানির মাধ্যমে হয়।	১১
পানি চক্র	যে চক্রাকার প্রক্রিয়ায় পানি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।	২০
পানি বিশুদ্ধকরণ	মানুষের ব্যবহারের জন্য পানিকে গ্রহণযোগ্য এবং নিরাপদ করার ব্যবস্থা।	২৩
প্রযুক্তি	আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ।	৬৩
প্রাকৃতিক সম্পদ	প্রকৃতিতে পাওয়া নানা বস্তু যা মানুষের কাজে লাগে।	৯০
বয়ঃসন্ধি	জীবনের এমন এক পর্যায় যখন আমাদের শরীর শিশু অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে কিশোর অবস্থায় পৌঁছায়।	৫০
বায়ুমণ্ডল	পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বায়ুর স্তর।	৮৪
বাস্তুসংস্থান	কোনো স্থানের সকল জীব ও জড় এবং তাদের মধ্যকার পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া।	৩
বাষ্পীভবন	কোনো পদার্থ তরল অবস্থা থেকে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া।	১৮

বার্ষিক গতি	সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর আবর্তন।	৫৪
বায়ুচাপ	বায়ু তার ওজনের কারণে ভূপৃষ্ঠের উপর যে চাপ প্রয়োগ করে।	৭৫
বায়ুবাহিত রোগ	যে সকল রোগ হাঁচি–কাশি বা কথাবার্তা বলার সময় বায়ুতে জীবাণু ছড়ানোর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।	৪৮
বিজ্ঞান	প্রকৃতি সম্পর্কিত যে জ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে এবং বর্ণনা করে।	৬৩
বিকিরণ	যে প্রক্রিয়ায় তাপ কোনো মাধ্যম ছাড়াই উৎস থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।	৩৬
বীজের বিস্তরণ	মাতৃউদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন স্থানে বীজের ছড়িয়ে পড়া।	৫
বৈশ্বিক উষ্ণায়ন	পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া।	৮২
বৃষ্টিপাত	মেঘ থেকে পানি-কণার বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসা।	৭৭
ভূমিক্ষয়	বায়ু বা পানি প্রবাহের ফলে মাটির উপরের স্তর সরে যাওয়া।	৯৫
মাধ্যম	কোনো কিছু স্থানান্তরের জন্য অথবা কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত বস্তু, যন্ত্র বা উপায়।	৩৬
মাতৃউদ্ভিদ	যে উদ্ভিদের অঙ্গ বা বীজ থেকে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়।	৫
মানবসৃষ্ট সম্পদ	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে মানুষ যে সকল সম্পদ তৈরি করে।	৯০
রাসায়নিক পদার্থ	রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বিভিন্ন পদার্থ।	৪৫
রাত	পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে সেই অংশের অবস্থা।	৫৬
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা	রোগ প্রতিরোধ করার জন্য শরীরের স্বাভাবিক সক্ষমতা।	৪৯
শক্তি	কাজ করার সামর্থ্য।	৩০
শক্তির রূপান্তর	শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন।	৩৩
শিল্পায়ন	শহর, বন্দর, গ্রাম ইত্যাদি স্থানে কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করা।	১০
শিল্পবিপ্লব	অর্থনীতির দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন (যা ১৮শ শতকে শুরু হয়েছিল) যেখানে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রচলিত	৬২

	যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির পরিবর্তে শক্তিচালিত যন্ত্র ও নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।	
শিশির	রাতে ঘাস, গাছপালা ইত্যাদির উপর জমা হওয়া বিন্দু বিন্দু পানির কণা।	১৮
শৈত্যপ্রবাহ	উত্তরের শুষ্ক ও শীতল বায়ু আমাদের দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে শীতকালে তাপমাত্রা অস্বাভাবিক কমে যাওয়া।	৭৮
সংক্রামক রোগ	বিভিন্ন জীবাণু যেমন– ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ইত্যাদি শরীরে প্রবেশের ফলে সৃষ্ট রোগ।	৪৭
হাইব্রিড গাড়ি	যে গাড়ি তেল ও বিদ্যুৎ দুই ধরনের জ্বালানি দিয়ে চলতে পারে।	৯৬
হিমবাহ	বিশাল আকারের বরফখণ্ড যা ঢাল বা উপত্যকা দিয়ে খুব ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলে।	১০
ইনপুট	কোনো কাজের জন্য কম্পিউটারের যে নির্দেশনা দেয়া হয়।	৭৩
প্রোগ্রাম	সমস্যা সমাধানের জন্য কোডসমূহকে যৌক্তিকভাবে সাজানো	৭৯
প্রোগ্রামিং	সমস্যা সমাধানের জন্য কোডসমূহকে যৌক্তিকভাবে সাজানোর প্রক্রিয়া	৭৯

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি–বিজ্ঞান

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **‘৩৩৩’** কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য